৩৮ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৩
স্টিফেন হকিং, বিজ্ঞানমনস্কতা	প্রদীপ্ত গুপ্তরায়	৫
সঞ্জয় ও দিব্যদৃষ্টি	আশীষ লাহিড়ী	৮
বখে যাওয়ার একাল সেকাল	অরুণালোক ভট্টাচার্য	১০
কারিগরিদক্ষ কর্মী, আমেরিকা	শৈবাল কর	১৩
নিরামিষ স্বাস্থ্যকর?	গৌতম মিস্ত্রী	১৬
"বীর" সাভারকার	প্রবীর মুখোপাধ্যায়	২০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	২২
সোমা নেই	বরুণ ভট্টাচার্য	২৪
জ্যোতিষ আইনে গলদ	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২৫
মরিতে চাহি না আমি	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
চাঁদাবাজি	সাধন বিশ্বাস	২৯
পুস্তক পর্যালোচনা		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর), কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩০৬৫৯০৫৮ /৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট: utsomanus@gmail.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanus/

সুখ-অসুখের কথা

ফের বাংলাদেশে খুন হলেন মুক্তমনা লেখক। গত ১৬ জুন, সোমবার সন্ধেয় মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে গুলি করে আততায়ীরা খুন করল শাহজাহান বাচ্চুকে। ৫৫ বছরের এই মুক্তমনা লেখক বিশাখা প্রকাশনীর মালিক ছিলেন। ব্লগে কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে লেখালিখি করতেন। সওয়াল করতেন মুক্তচিন্তার পক্ষে। একসময় জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। জানা গেছে, সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ তিন রাস্তার মোড়ে একটা ওষুধের দোকানের সামনে বসে কথা বলছিলেন শাহজাহান। সেই সময় চারজন দুটি মোটরবাইকে চেপে এসে ওঁকে ধরে রাস্তায় নিয়ে আসে। প্রথমে বোমা ফাটিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে। তারপর খুব কাছ থেকে গুলি করে। বাংলাদেশে মুক্তমনা মানুষকে ধারাবাহিকভাবে খুন করা চলেছেই।

এদেশের অবস্থাও যে খুব ভালো, তা নয়। দাভোলকার, পানেসর থেকে গৌরী লঙ্কেশ— অনেক প্রাণ যাচ্ছে। খুনিরা যথারীতি অধরা। এদিকে সম্প্রতি নির্ভীক সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কাশ্মীরে আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারালেন সুজাত বুখারি। কেন্দ্র সরকারের কাশ্মীর নীতিরও যেমন সমালোচনা করতেন, তেমনি মৃত্যুভয় উড়িয়ে তুলোধোনা করতেন কাশ্মীরের 'ঘরোয়া' জঙ্গিদেরও। বারতিনেক হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। শেষমেশ ১৪ জুন শ্রীনগরে নিজের অফিসের বাইরে খুন হলেন।

অভিযোগ ছিল, স্টারলাইট তামার কারখানার দূষণে ঘরে ঘরে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ ছড়াচ্ছে। কারখানা মালিক বেদান্ত গোষ্ঠী তাতে কান দেয়নি। মুনাফার লোভে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা তো নেয়ই নি, উপরন্তু উৎপাদন বাড়াতে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরেকটা কারখানা গড়তে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছিল। রুখে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ মানুষ। গত ২২ মে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে ১৩ জন মারাও যান। মুখ্যমন্ত্রী পালানিস্বামী প্রথমে পুলিশের পক্ষ নিলেও শেষমেশ পিছু হটেন। তামিলনাড়ু সরকার তুতিকোরিনে স্টারলাইটকে তাদের তামার কারখানা পুরোপুরি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে। সমবেত প্রতিবাদের জয় হয়েছে। অন্ধকারে এ এক আশার আলো।

দক্ষিণ দিল্লিতে ১৬,৫০০ গাছকাটায় ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছিল বন দপ্তর। আরও কিছু কাটার আবেদন লাইনেই ছিল। এই গাছকাটার কারণ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের থাকার জায়গা তৈরি। যাদের পরিবেশ, গাছপালা রক্ষার কথা তারাই মেতেছে

হননে। দক্ষিণ দিল্লিকে ওদের চাই যে কোনো শর্তে। পরিবেশের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ে শুরু হয়েছিল দেশ জুড়ে প্রতিবাদ— 'সেভ দিল্লি'জ ট্রিজ'। ৮৯৭১২২২৯১১ নম্বরে মিস কল দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল এক সংগঠন। বিপুল সাড়া মিলেছে। সমবেত প্রতিবাদে স্থগিত হয়েছে গাছকাটার আদেশ। দুর্দিনে এও আরেক খুশির খবর।

দু-তিন দশক আগেও আমরা বাজারে যেতাম থলে হাতে। থলের রকমফেরও থাকত। কোনোটা মাছ আনার, কোনোটা আনাজের, কোনোটা মুদিখানা দ্রব্যের বা চাল আনার। কেউ কিনত, কেউ পুরনো প্যান্ট কেটে বানিয়ে নিত। অফিসবাবুরা ব্যাগের মধ্যে থলে রেখে দিতেন। অফিসফেরত শিয়ালদা বা উল্টোডাঙা বা অন্য স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে সস্তায় আনাজপাতি কিনে বাড়ি ফিরতেন। সেই দিন গেছে। এখন হাতে মানিব্যাগ আর মোবাইল নিয়ে আমরা বেরোই। ফিরি একাধিক ক্যারিব্যাগ আঙুলে ঝুলিয়ে। দোকানিরাও জেনে গেছে। তারা না চাইলেও দিয়ে দেয়। না দিলে বাবুরা জিনিস কিনবে কী করে! পঞ্চাশ গ্রাম লঙ্কা নিলেও সে প্যাকেটে ভরে দেয়। আমাদের এই প্যাকেট-হ্যাংলামোর মেয়াদ কিন্তু খুবই অল্প। বাড়িতে নিয়ে আসার পরই তার প্রয়োজন ফুরোয়, ঠাঁই হয় আবর্জনার পাত্রে। দুই পরিবেশ বিশেষজ্ঞ সি কে মিশ্র ও এরিক সলহাইম বলছেন, 'আনফরচুনেটলি, উই হ্যাভ আ প্ল্যানেটারি অ্যাডিকশন টু দ্য ভেরি ওয়র্স্ট টাইপস অভ প্লাস্টিক, দ্য কাইন্ড দ্যাট ইজ ইউজড ফর আ ফিউ মিনিটস অর সেকেন্ডস অ্যান্ড দেন ডিসকার্ডেড।' ওঁরা হিসেব দিচ্ছেন, আমাদের এই ফেলে-ছড়ানোর জেরে বছরে ১ কোটি ২০ লাখ টন এই ধরনের প্যাকেট গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। ক্ষতি করছে উদ্ভিদ, প্রাণী, উপকূলের আশপাশে বসবাসকারীদের এবং ঢুকে পড়ছে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খলে। তিমি আর কচ্ছপদের হাল দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়। কদিন আগেই একটা তিমিকে মৃত পাওয়া গিয়েছে, তার পেট বোঝাই ছিল প্লাস্টিকে। অবোধ গরুও আঁস্তাকুড়ে ফেলা প্লাস্টিকের প্যাকেট খাচ্ছে এন্তার। গোমৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। গো-মাতার সন্তানরা অবশ্য এ নিয়ে এখনও নীরব। এমনকি মেরু প্রদেশেও হিমশৈলের ওপর প্লাস্টিক ভাসতে দেখা যাচ্ছে! পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্লাস্টিকের জলের বোতল নিয়ে পরীক্ষা করে সবগুলোর জলেই প্লাস্টিক অণুকণা পাওয়া গিয়েছে। না চাইতেই প্লাস্টিক আমাদের অবশ্যখাদ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানে মাঝে মাঝে ক্যারিব্যাগ নিয়ে লোকদেখানো কড়াকড়ি হয়। তারপর আবার যে কে সেই। কারণ দেশের তথাকথিত শিক্ষিত, সচেতন, দেশদুনিয়ার তাবৎ কিছুর বিদগ্ধ সমালোচক লোকজনই প্লাস্টিক ব্যাগের জন্য দোকানিকে চাপ দেয়। সর্ষের মধ্যেই ভূত। বেচারা ক্যারিব্যাগকে আমরা শূলে চড়াচ্ছি, যেন সব দোষ ওরই। ওদিকে জল থেকে ঠাণ্ডা পানীয় সবই প্লাস্টিকের। খাওয়ার পর গাড়ির জানলা খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অতিপরিচিত দৃশ্য। এর বাইরেও চাল, ডাল, তেল, নুন এমনকি বিড়ি যে বিড়ি, সেও এখন প্যাকেটবন্দী। পালাবার পথ নেই যম আছে পিছে। এত প্যাকেট কোথায় যাবে! সিকিমের মতো ছোট্ট দেশে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ, চাষবাসে রাসায়নিক প্রয়োগও। আমরা অনেক শিক্ষিত, উন্নত, বিজ্ঞান-জানা তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করি না! অনেক ব্যবসায়ী একে নিয়েই ফেঁদেছে নতুন ব্যবসা। বলছে 'অর্গানিক'। পাবলিকে 'খাচ্ছেও'। বেশি গাঁটের কড়ি ফেলে 'অর্গানিক' ফুড কিনছে। মানে যা নাকি বিনা রাসায়নিক সার বা কীটনাশকে তৈরি। ব্রাউন ব্রেড, ব্রাউন রাইস কেনা স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে উঠেছে। একেই বোধহয় ঘোর কলি বলে!

আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা বলতেন, 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ', অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। এখন দেখা যাচ্ছে অধ্যয়ন ছাড়াও ছাত্রদের অনেক কাজ! বিপ্লব-আন্দোলনের কথা থাক। সে বড় বিতর্কের বিষয়। কলেজে কলেজে ছাত্রভর্তি 'আজ কি তাজা খবর'। কোন বিষয় নিয়ে ভর্তি হতে কত টাকা নজরানা দিতে হবে, তার তালিকাও সংবাদপত্রের সুবাদে সবার জানা হয়ে গিয়েছে। গত আশি-নব্বইয়ের দশকে দেখতাম, ছাত্র পরিষদ এসএফআই ডিএসও ইত্যাদি ইউনিয়নের দাদারা ওত পেতে থাকত, নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলেই তাকে নিজের দলে টানার। ওদের কাছ থেকে নেওয়া হত ইউনিয়নের সামান্য চাঁদা। নেতারা দলে টেনেই খুশি থাকতেন। গত কয়েক দশকে ছবিটা আমূল বদলে গেছে। তোলার দাবি ক্রমশ আকাশ ছুঁচ্ছে। এই নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, নিজেদের মধ্যে মারামারি— সবই চলছে। কলেজেই রাজনীতির হাতেখড়ি। ছোট নেতা তৈরির কারখানা। বড় দাদারা প্রশ্রয়ের হাত মাথায় রাখছেন। নিজেদের বখরা বুঝে নিচ্ছেন। ছোট নেতারা যথেচ্ছাচারের ডানা মেলছে। একটি হতদরিদ্র মেয়ে তো দাদাদের খাঁই মেটাতে গিয়ে মায়ের চুড়ি বিক্রি করে দিয়েছিল। তারপরেও ভর্তি হতে পারে নি। কেউ যদি একে ক্রিমিনালাইজেশন বা অপরাধকরণে দীক্ষা বলেন, খুব ভুল বলবেন কি! এ বড় সুখের সময় নয় যে। আর যে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা শুরু হচ্ছে তোলা ভেট দিয়ে, তাদের বিচারধারা, মানসিকতা সুস্থতর হয়ে গড়ে উঠবে!

পরিশেষে আরেক দুশ্চিন্তার কথা। তা হল ধর্মীয় উৎসব নিয়ে অতি-মাতামাতি। যে রামনবমী কবে আসত, কবে যেত, তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না, তাও এখন বড় উৎসবের চেহারা নিয়েছে। রথযাত্রা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুরু হয়েছে হাস্যকর দড়ি-টানাটানি। যাবতীয় মুক্তচিন্তা, বিজ্ঞানমনস্কতা চক্রদলিত করে এগিয়ে চলেছে ধর্মীয় রথ।

উমা

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি

সঙ্গীতবোধ বনাম সঙ্গীতবধ

আশীষ লাহিড়ী

(৫)

গত ১৯ মে ২০১৮ একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। দেখে ও শুনে বোঝা গেল, কলিকাতা আজও কলিকাতাতেই আছে, লন্ডনে যায়নি।

প্রয়াত দিলীপকুমার চৌধুরী ছিলেন হিন্দুস্তানি মার্গসংগীতের গুণী ও সঙ্গীতপাগল মানুষ। জীবনে প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু কখনো সঙ্গীত-সাধনার পথ থেকে সরেননি। দিলীপকুমার চৌধুরী ঈশ্বরভক্ত ও বিবেকানন্দ-ভক্ত ছিলেন। একটি 'সখের দল' গড়ে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন 'সর্বানন্দ সঙ্গীতসমাজ।' সেই সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণে প্রতি বছর একটি করে সঙ্গীত বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এ বছরের বক্তা ছিলেন সৌরীন ভট্টাচার্য।

সৌরীনবাবু অর্থশাস্ত্রের মানুষ, দর্শনের মানুষ, সাহিত্যরও মানুষ, কিন্তু কখনো শুনিনি তিনি সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ। তাই খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম এই বক্তা নির্বাচনে। কিন্তু আলোচনার বিষয়টি দেখে ঘোর ভাঙল— সঙ্গীতবোধ-শিক্ষা। যে-লোক গানবাজনা শেখেনি, গলায় সুর নেই, যে বোঝে না কোমল গা আর শুদ্ধ গা-র পার্থক্য, কিন্তু সুর শুনলে মোহিত হয়, তার সঙ্গীতবোধ আসছে কোথা থেকে, সে-বোধের চরিত্রই-বা কী? সেই বোধটাকে শিক্ষার দ্বারা বাড়িয়ে তোলার পথ কী? এই ছিল সৌরীনদার আলোচ্য বিষয়। খুব সাদামাঠা ঢঙে শুরু করে তিনি বিষয়টাকে অসামান্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেলেন। দিলীপকুমার চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গলায় বা হাতে কেন সুর খেলে না, এই আক্ষেপ জানানোয় দিলীপকুমার তাঁকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'কেন, রেগে গেলে যে-সুরে কথা বলো, ভালোবেসে কি সেই একই সুরে কথা বলো, ক্লাসে ছাত্রদের সঙ্গেও কি সেই সুরে কথা বলো?' অর্থাৎ সুর সবারই গলায় আছে, সুর ভাবেরই অঙ্গ। কেউ সেটাকে চর্চার মধ্য দিয়ে একটা সুনিয়মিত রূপ দিতে পারে, কেউ পারে না। এখান থেকে সৌরীনদা স্বভাবতই চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথে, যিনি কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেই বলেছিলেন: সঙ্গীতের আসল কথা হল 'ভাব।' আলোচনা একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেল।

আরো একটা মূল্যবান কথা বললেন সৌরীনদা। বাজার প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গীতবোধের, আমাদের সংস্কৃতির সর্বনাশ করে দিচ্ছে, এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু তাই বলে, যা-কিছু বাজারি নয়, তা-ই কি ভালো? পক্ষান্তরে, বাজারের মধ্যেও কি ভালো সুর, ভালো গায়ক বা বাজিয়ের সন্ধান মেলে না? কেউ কেউ গলায় বা যন্ত্রে ঠিকঠাক সুর লাগাতে পারেন না, কিন্তু সগর্ব বাজার থেকে সরে থাকেন; শুধু সেই কারণেই কি তাঁদের মহৎ শিল্পী বলতে হবে? আবার খুব যত্নে গানবাজনা শিখে টাকার প্রয়োজনে কিংবা লোভে কেউ বাজারে নিজেকে বেচলেন, শুধু সেই কারণেই কি শিল্পী হিসেবে তিনি নিন্দনীয় হয়ে গেলেন? সৌরীন ভট্টাচার্যের মতে গুণবিচারের সময় নির্দিষ্ট পরিবেশনটাই বিবেচ্য— বাজারেই হোক, কিংবা বাজারের বাইরে। এইসব সোজাসাপটা প্রসঙ্গ নম্র কণ্ঠে তুললেন সৌরীনদা। শুনে সার্থক মনে হল কলকাতায় বেঁচে-বর্তে থাকা।

দিলীপকুমার চৌধুরী ও তাঁর পুত্র সর্বানন্দ চৌধুরী দুজনেই বিবেকানন্দ-ভক্ত। খুব সঙ্গত কারণেই তাই ১৯ মে-র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের শিবানন্দ প্রেক্ষাগৃহে। প্রথমেই প্রয়াত দিলীপকুমার চৌধুরীর গানের টেপ-রেকর্ড শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিল। ভরাট গম্ভীর খোলা গলায় আ-উচ্চারণ, স্পষ্ট তান, গমক যেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠের কথা মনে পড়িয়ে দিল। তারপর সংযত, শ্রদ্ধা-বিনম্র অথচ ভাবালুতা-বর্জিত পরিচ্ছন্ন বাংলায় এক ঘোষিকা অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে দু-কথা বলে শ্রোতাদের হৃদয় ও মনন স্পর্শ করলেন। একটি সত্যিকারের রুচিসুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত সন্ধ্যার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল শ্রোতাদের মন।

তারপরই হরিষে বিষাদ। রীতিমাফিক বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সহ-সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ 'সূচনা-ভাষণ' দেবার জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন মস্ত সঙ্গীত-গুণী ছিলেন, সেই অতি প্রাচীন সংবাদ

অনেকক্ষণ ধরে শোনালেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণও যে অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন, সেকথাও বললেন। আমরা জানলাম, সারদাময়ী দেবীও খুব ভালো গান গাইতেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দও ছিলেন সংগীতের বোদ্ধা। সময়জ্ঞান না-থাকায় তিনি এই কথাগুলি বড়ো বেশি সময় নিয়ে বলতেই থাকায় শ্রোতারা উসখুশ করতে থাকেন।

বিবেকানন্দর মতে ধ্রুপদ আর কীর্তনই বিশুদ্ধ সঙ্গীত, জানালেন বলভদ্রানন্দজি। যেটা জানালেন না তা এই যে, বিবেকানন্দ টপ্পা, খেয়াল, ঠুংরি এসব পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে, মুসলমানি প্রভাবে হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের ক্ষতি হয়েছিল এবং ধ্রুপদ আর কীর্তন মুসলমানি প্রভাব থেকে মুক্ত, তাই বিশুদ্ধ। যদিও, পণ্ডিতেরা বলেন, বিবেকানন্দ স্বয়ং যে-ধ্রুপদে ওস্তাদ ছিলেন, তা অবশ্যই মুসলমানের ছোঁয়ায় অশুদ্ধ। বলভদ্রানন্দজি একথাও জানালেন না যে, কীর্তন সম্বন্ধে বিবেকান্দর সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি অবস্থান ছিল। কীর্তন-শ্রবণ বা গায়নের ফল বর্ণনা করে বিবেকানন্দ বলেছিলেন:

প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর যেই সংকীর্তন থামে, তখন সে ভাবটা হু হু করে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচু উঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন হয়ে পড়তে চায়। আমেরিকাতেও ওইরূপ দেখেছি কতকগুলো লোক গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে— তারপর গির্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুকলে। (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯-৪২৯, উদ্বোধন, ১৯৬২)

কীর্তন শুধু কামদ নয়, 'মেয়েলি'ও বটে— 'ছেলেবেলা থেকে মেয়েমানুষি বাজনা শুনে শুনে, কীর্তন শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হয়ে গেল।' তাই তাঁর ফরমান: '... যেসব music-এ মানুষের soft feelings উদ্দীপিত করে, সে-সব কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে হবে। (৯-২১৯)। এসব কথা বলভদ্রানন্দজির না-জানার কথা নয়।

একসময় বলভদ্রানন্দজির হঠাৎ মনে পড়ল, আজকের বক্তৃতার বিষয় 'সঙ্গীতবোধের শিক্ষা।' অমনি অকুতোভয়ে তিনি মূল বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বার্তা বিতরণে প্রবৃত্ত হলেন, তাঁর পিছনে তখন চেয়ারে বসে সেদিনের অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধক শঙ্খ ঘোষ। অসাধারণ মৌলিকতা সহকারে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই সাধারণ সহ-সম্পাদক জানিয়ে দিলেন, সঙ্গীতবোধ বড়োই ভালো জিনিস, পবিত্রও বটে। সঙ্গীতবোধ থাকলে ঈশ্বরসাধনার পথ প্রশস্ত হয়। শুধু কি তাই? সঙ্গীতবোধের অনেক 'প্র্যাকটিকাল' উপযোগিতাও আছে। উনি জানালেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শাখাতেই অনেক গোরু পোষা হয়, এবং তাদের প্রচুর যত্ন আত্তি করা হয়। তারা সকলেই খুব পুষ্ট, হৃষ্টও বটে। তাদের সঙ্গীতবোধও রীতিমতো পরিণত। নিয়মিত তাদের উত্তম সঙ্গীত শোনানো হয়, যার ফলে তাদের হৃষ্টতার মাত্রা বাড়ে এবং তারা আরো বেশি করে দুধ দেয়। ঠিক কী ধরনের গানে তারা কতখানি দুধ বেশি দেয়, ধ্রুপদে না কীর্তনে; যন্ত্রসঙ্গীত না কণ্ঠসঙ্গীত; কীসে তাদের রুচি বেশি; ইউরোপীয় ক্ল্যাসিকাল বা রক মিউজিকে তাদের দুগ্ধক্ষরণ বাড়ে কিনা; আধুনিক বাংলা ব্যান্ড কিংবা রবীন্দ্রসঙ্গীত এ ব্যাপারে কতখানি উপযোগী, এসব অত্যন্ত জরুরি বৈজ্ঞানিক তথ্যও তিনি নিশ্চয়ই পেশ করতেন; কিন্তু দুঃখের কথা, কেউ একজন তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, আজকের প্রধান বক্তা তিনি নন, সৌরীন ভট্টাচার্য এবং তিনি মঞ্চে অপেক্ষমাণ। অগত্যা বলভদ্রানন্দজির বাকি জ্ঞানটুকু বকেয়া রয়ে গেল।

তবে আমরা বাঙালি। মন্বন্তরে মরিনি, সাপের মাথায় নেচেছি, বাঘের সঙ্গে আমাদের বাস, আমরা কি অত সহজে বলভদ্রনান্দজির এই সঙ্গীত-বধ কর্মসূচিতে কাবু হই? গীতসুধায় ওটুকু চোনা আমরা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারলাম। এর পর যখন সৌরীনদা তাঁর ভাষণ দিলেন, মন ভরে গেল। এবং তারও পরে, সরোদে দীপঙ্কর চৌধুরী, সন্তুরে দিশারী চক্রবর্তী এবং পাখোয়াজে নিশান্ত সিং যখন যৌথভাবে পরিবেশন করলেন পূরবী ও ভূপালিতে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দুটি গৎ, তখন মনে হল, দুনিয়ার বলভদ্রানন্দজিরা শত চেষ্টা করলেও বাঙালির সঙ্গীতবোধকে বধ করতে পারবেন না। আমাদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই, এই বোধে নিশ্চিত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম।

উমা

স্টিফেন হকিং এবং বিজ্ঞানমনস্কতা

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৫ তম অধিবেশন মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল গত ১৬ থেকে ২০ মার্চ। আর অধ্যাপক স্টিফেন হকিং প্রয়াত হলেন ১৪ মার্চ, দিনটা সাধারণভাবে সারা বিশ্বে পাই-দিবস হিসাবে পরিচিত। ১৬ মার্চ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হকিংয়ের স্মরণে বলেন, "আমরা সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী, মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ স্টিফেন হকিংকে হারিয়েছি। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, বেদে এমন কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে যা আইনস্টাইনের $e=mc^2$ তত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি ভাল।" [The Telegraph (INDIA), 17 March, 2018] সাংবাদিক এবং বিজ্ঞানীরা যখন এই বক্তব্যর উৎস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি সাংবাদিকদের উৎস খুঁজে নিতে বলেন! 'স্টিফেন হকিং ফাউন্ডেশন'-এর এক সদস্য অধ্যাপক ম্যালকমপেরি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের প্রবল বিরোধিতা করে বলেন, "এমনটা হতেই পারে, যখন সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় কথা বলছিলেন, তখন হয়ত কথা প্রসঙ্গে বেদের কথা বলেছেন— বিগ ব্যাং, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি বা সীমাহীনতার প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বাইবেল বা বেদের প্রসঙ্গ আনতেই পারেন, কিন্তু তাই বলে বেদে এমন কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে যা আইনস্টাইনের $e=mc^2$ তত্ত্বের চাইতে অনেক বেশি ভাল— আপনাদের মন্ত্রীমহোদয়ের দেওয়া এই দাবি- একথা হকিং বলতেই পারেন না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।" [The Telegraph-এ যেমন বলেছেন] লেখার শুরুতেই এই প্রসঙ্গ আনার একটাই কারণ হল, স্টিফেন হকিং নামের এক আদ্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক অধ্যাপকের মুখে এইরকম বালখিল্য কথা বসিয়ে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই কি অপমান করছি না? "সবই ব্যাদে আছে"- এই ধরনের হাস্যকর কথা থেকে আমাদের মুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে হকিংয়ের একটা উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৮৯ সালে স্পেনে 'প্রিন্স অভ অস্টারিয়াস হারমনি অ্যান্ড কনকর্ড প্রাইজ' নেবার সময় তিনি বলেছিলেন,"কিছু মানুষ এই পরিবর্তনগুলো বন্ধ করে দিতে চায় এবং তাদের খাঁটি এবং সহজতর জীবনে ফিরে যেতে চায়।... কিন্তু চাইলেই কি আমরা ঘড়িটাকে পেছন দিকে নিয়ে যেতে পারব? জ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে আমরা কেউ ভুলতে পারবে না। কিংবা কেউ ভবিষ্যতের অগ্রগতিও রোধ করতে পারবে না। "আমরা, এই লেখায়, তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা এবং জীবনের প্রতি ভালবাসাকেই প্রধান আলোচনার বিষয় হিসাবে বেছে নেব।

অধ্যাপক স্টিফেন হকিং নিয়ে আলোচনা শুরু করলেই আমরা তাঁর শারীরিক অক্ষমতাকে প্রাথমিকভাবে তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে উপস্থাপনা করি। তাঁর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বই "A Brief History of Time" নিয়ে বিভিন্ন কাগজ যে ধরনের মন্তব্য করেছিল, তা এই ধারণাকেই সমর্থন করে। স্টিফেনের ভাষায়, "আমি দেখলাম, প্রায় সব সমালোচনাই যদিও অনুকূলে কিন্তু খুব ইতিবাচক নয়। সমালোচকেরা সাধারণভাবে একটা ছক অনুসরণ করেন: যেমন আমেরিকার সমালোচকেরা বলেন- স্টিফেন হকিংয়ের লুই গেহরিগ রোগ (Lou Gehrig's disease) আছে, বা ব্রিটিশ সমালোচকের কথায় তাঁর মোটর নিউরনের রোগ আছে (motor neuron disease)। তিনি হুইলচেয়ারে চলাফেরা করেন, কথা বলতে পারেন না এবং কেবলমাত্র x সংখ্যক আঙুল নাড়াচাড়া করতে পারেন (যেখানে x সংখ্যাটি এক থেকে তিনের মধ্যে হতে পারে, যে ভুল তথ্য তাঁরা কোন এক লেখায় পেয়েছেন।)।" হকিং হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতেন, কথা বলতে পারতেন না, শেষের দিকে কেবলমাত্র মুখের একটা কি দুটো পেশী নাড়াচাড়ার মাধ্যমেই এবং কম্পিউটারের সাহায্যে তিনি কথা বলতেন, এটা আমরা সবাই জানি। অথচ দেখুন, এই অবস্থাতে যখন আমরা অনেকেই ভেঙে পড়ি, জীবনে থেকে আর কী হবে- এই ধরনের নেতিবাচক চিন্তা আমাদের গ্রাস করে, হকিং তাঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এই হুইলচেয়ারে বসেই নাচে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন! এবং এ কথাও বলেছেন, তাঁর এই শারীরিক অক্ষমতাই তাঁর গবেষণাকে আরো গভীরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে! [তথ্যসূত্র: Curious Minds: How a Child Becomes a Scientist - John Brockman (Pantheon Book, New York)] তাঁর রোগ নিয়ে এত প্রচার হকিং নিজেও পছন্দ করতেন না। এই

শারীরিক অক্ষমতা তো তিনি মানসিক অতি-সক্ষমতা দিয়ে জয় করেছিলেন। তিনি যে মানসিকভাবে অন্য অনেক তথাকথিত শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম, সেটা বোঝানোর জন্যই বোধহয় তিনি শূন্য-মহাকর্ষ বল পরীক্ষায় স্বচ্ছন্দে রাজি হয়েছিলেন। এ ধরনের এক কঠিন বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় নিজেকে সামিলও করেছিলেন (ছবি ১)।

ছবি ১- স্টিফেন হকিং, তাঁর ৬৫ বছর বয়সে, শূন্য-মহাকর্ষ বলে ভাসমান। কেন তিনি এই ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "শারীরিক অক্ষমতা কোনো মানুষের পক্ষে বাধা হতে পারে না যতক্ষণ না সে মানসিকভাবে অক্ষম হয়। [ছবি সৌজন্যে: স্টিভ বক্সাল, জিরো গ্র্যাভিটি কর্পোরেশন]

আমরা যদি তাঁর শৈশব থেকে বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, তিনি বেশ কষ্টের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন। বাবা ডাক্তার ছিলেন, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ওষুধ (Tropical Medicine) নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁকে প্রায়ই আফ্রিকাতে যেতে হত গবেষণার কাজে। মা ছিলেন সেক্রেটারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থিক অভাব ছিল। একটা ইস্কুল থেকে আরেকটা ইস্কুল পরিবর্তন করেছেন বিশ্বযুদ্ধ এবং আর্থিক সমস্যার কারণে। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হয় স্কুলের কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে। আলোচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ছিল, রেডিওচালিত মডেল থেকে শুরু করে ধর্ম, প্যারাসাইকোলজি থেকে ফিজিক্স! আরেকটা আলোচনাও হকিং এবং তাঁর বন্ধুরা করতেন: মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য এবং এই সৃষ্টির পেছনে ভগবান নামের কোনো একজনকে দাঁড় করানোর যৌক্তিকতা নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে স্কুলজীবন থেকেই হকিংয়ের অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়ার ইচ্ছে তৈরি হয়, যদিও তাঁর বাবার ইচ্ছে ছিল স্টিফেন ডাক্তারি নিয়ে পড়াশুনো করুক। তিনি স্কুল থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা দিলেন এবং সেখানে নির্বাচিত হলেন। অক্সফোর্ডে থাকাকালীনই তাঁর অসুস্থতা ধরা পড়ে। এবং এই অসুখই তাঁর জীবন সম্পর্কে ধারণাটা পাল্টে দেয়। তাঁর নিজের কথায়: "যখন, তোমার তাড়াতাড়ি মৃত্যু হতে পারে- এই সম্ভাবনার মুখোমুখি হোচ্ছ, তখন তুমি বুঝতে পারবে, জীবনে বেঁচে থাকা সার্থক এবং অনেক কিছুই তুমি করতে চাইছ।" জীবনের প্রতি এই ইতিবাচক মনোভাবই স্টিফেন হকিংকে সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের মাত্রা এনে দেয় এবং জীবিত অবস্থাতেই তিনি এক কল্পকাহিনীর নায়ক হয়ে ওঠেন। গবেষণার জন্য তিনি তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার মহাবিশ্বতত্ত্বকে বেছে নেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাথমিকভাবে হকিং কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই পোষণ করতেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে 'নেচার' পত্রিকায় একটা লেখা লেখেন। [সূত্র: Black Hole Explosions?, S. W. Hawking, Nature, 248, pp 30-31 (1st March, 1974)] যাতে তিনি বলেন, কৃষ্ণগহ্বরের গণনার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রটাকে বাদ দিই।

কিন্তু যদি কোয়ান্টাম ক্ষেত্রকে গণনার মধ্যে আনি, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেশকালকে (আণবিক স্তর বা তারও কম পাল্লা) কৃষ্ণগহ্বরের গণনার ক্ষেত্রে আনা হলে, এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে: দেখা যাবে কৃষ্ণগহ্বর ফোটন কিংবা নিউট্রিনো কণা নির্গত করছে! এই তাপীয় বিকিরণের ফলে কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমে যেতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরের এই ভর কমার ফলে পৃষ্ঠতলের মহাকর্ষ বল বৃদ্ধি পাবে এবং তার সঙ্গে বিকিরণের হারও বৃদ্ধি পাবে! এই বিকিরণের ফলে একটা সময়ে মহাশূন্যে কৃষ্ণগহ্বর বিলীন হয়ে যাবে! এই বিকিরণকে হকিং বিকিরণ বলা হয়। এই গবেষণাকে পদার্থবিদ্যায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা হয়। হকিংয়ের এই বড় সময়কালের পাল্লার (Large Scale Structure of space time) সঙ্গে ছোট সময়কালের পাল্লাকে (Quantum Structure of Space time) মেলানো যুগান্তকারী তো বটেই! হকিং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৭৮ সালে বলেন, "একজন মানুষ যদি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেন, তবে তাঁকে বা তাঁর অণুগুলোকে আমরা ফেরত পাব না, কিন্তু তাঁর সম্মিলিত ভর এবং শক্তিকে ফেরত পাব।" "ভগবান যদি পাশা খেলেন..."— আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত উক্তিটা তিনি সামান্য পালটে দিয়ে বললেন, "ভগবান মহাবিশ্বকে নিয়ে পাশা খেলেন ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে এমনভাবে খেলেন যে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না!"

স্টিফেন হকিং ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি নিজেকে নাস্তিক বলেই প্রচার করেছেন। আমরা হকিংকে এক বিজ্ঞানমনস্ক, সংবেদনশীল মানুষ হিসাবেই জানি, চিনি। যেমন, এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "অনেক সময় আমরা শুনি, বিজ্ঞান সব কিছু জানে না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বিজ্ঞান সব কিছু জানে না। কিন্তু বিজ্ঞান সব কিছু জানে না বললে বোঝায় না যে বিজ্ঞান কিছুই জানে না। বিজ্ঞানের সাহায্যেই কয়েক লক্ষ মানুষ এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, এবং বিজ্ঞানের সাহায্যেই প্রকৃতির রহস্য আমরা ভেদ করছি।" ইনি ২০০৩ সালে ব্রিটিশ-আমেরিকা শক্তির ইরাক আক্রমণের নিন্দা করেন। ধর্মের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছিলেন। 'The Telegraph(UK)'– ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০- এ একটা প্রবন্ধ বেরোয় "Has Stephen Hawking ended the God debate?" নামে। সেখানে তাঁর সে সময় প্রকাশিত বই The Grand Design-এর উদ্বোধন উপলক্ষে সাংবাদিকদের বলেন, "ভগবান এই মহাবিশ্ব তৈরি করেন নি বা কেউই আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই মহাবিশ্ব কিছু অবধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়। আমরা এই প্রশ্ন করতেই পারি, কীভাবে এই নিয়মগুলো এল?" তিনি আরো বলেন, "ভগবান নামের এই বিশেষ পবিত্র উপহারকে খোঁজার দিন এখন শেষ হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এম-থিয়োরী নামে এক ধরনের তত্ত্ব বের করেছেন, যা দিয়ে সব প্রাথমিক কণাদের এবং বলদের আচরণ বোঝা যাবে। এমনকি মহাবিশ্বের জন্ম সম্পর্কেও জানা যাবে। তত্ত্বটি যদি কোনো নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়, তবে এই তত্ত্বই সম্ভবত সব ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বকে খারিজ করে দেবে।" এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক অবশ্য লেখেন, "ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের শতাব্দীপ্রাচীন এই বিবাদ এত সহজে মীমাংসা হবার নয়।" খ্রিষ্টধর্মের ডারউইনবাদের বিরোধিতায় হকিং ছিলেন কঠোর সমালোচক। পরজন্ম বা আত্মায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবন সম্পর্কে প্রত্যয়ী এই বিজ্ঞানী বলতেন, "মাটির দিকে না তাকিয়ে আকাশের তারার দিকে তাকাও। যা দেখছ, সেটা বোঝার চেষ্টা করো, এবং মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নিয়ে বিস্মিত হও, জিজ্ঞাসু হও। জীবন যত কঠিনই হোক না কেন, সবসময় জানবে তার একটা সফল সমাধান থাকবেই।"

অধ্যাপক স্টিফেন হকিং বেঁচে থাকবেন তাঁর মহাবিশ্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন গবেষণায় (যেরকম একটি গবেষণাপত্র খুব সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুর পরও প্রকাশিত হয়েছে।), সাধারণের উপযোগী বিভিন্ন লেখায়।

উমা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার **ফোন নম্বর**: ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ -১২৬৩৭।

মহাভারত-এর সঞ্জয়, কমপিউটর আর দিব্যদৃষ্টি

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল ২০১৮। ত্রিপুরার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত বিপ্লব দেব বক্তৃতা দিতে দিতে একটু গরম খেয়ে গিয়েছিলেন। গরমের চোটে তিনি বলে বসলেন : মহাভারত-এর যুগে নিশ্চয়ই কমপিউটর ছিল নইলে, ৫০ কি.মি. দূরে কী হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দিলেন কী করে?

কথাটা নিয়ে সোশাল মিডিয়া-য় (ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ ইত্যাদিতে) বিস্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বেরল। কোনো কোনো কাগজে বলাও হলো: আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী গণেশ ঠাকুরের গজমুণ্ডর পেছনে প্লাস্টিক সার্জারি খুঁজে পেয়েছিলেন, এও তা-ই। তাতে এতটুকু না ঘাবড়ে বিপ্লববাবু আবার বললেন: 'কোনও না কোনও টেকনিক তো ছিল। সেই টেকনিকের নাম দেওয়া হয়েছিল সঞ্জয়। তার মধ্যে আমি তো এখনকার জমানার ইন্টারনেট দেখতে পাই' (গৌতম হোড়কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, এই সময়, ২২ এপ্রিল ২০১৮)।

'এ সমস্তই ব্যাদে আছে'

ব্যাপারটা এতই হাস্যকর যে এ নিয়ে কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। সেই কোন্ ছোটোবেলা থেকে এই ধরণের গল্প শুনে আসছি। মেঘনাদ সাহাকে তাঁরই দেশের (ঢাকা) এক লোক জিগেস করেছিলেন: তুমি কী বৈজ্ঞানিক কাজ করেছ? যৌবনের উৎসাহে মেঘনাদও সূর্য ও নক্ষত্রর প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আয়োনাইজেশন অফ এলিমেন্টস-এর তত্ত্ব বোঝাতে শুরু করলেন। দু-এক মিনিট শুনেই সেই উকিলবাবু বললেন: 'এ আর নতুন কী তত্ত্ব হলো? এ সমস্তই ব্যাদে আছে।' মেঘনাদ সাহা জানতে চাইলেন: বেদ-এর কোন্ অংশে এসব তত্ত্ব আছে? নির্বিকারচিত্তে উকিলবাবু জবাব: 'আমি তো কখনও ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নতুন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর, সমস্তই ব্যাদে আছে' (মেঘনাদ রচনা সংকলন, রমা সাহা, ১৮৮৭ শকাব্দ, পৃ. ১০৭। মেঘনাদ সাহার এই লেখাটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪০-এ)।

এস ওয়াজেদ আলী-র সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়ে যায়: 'সেই ট্র্যাডিশন [ঐতিহ্য] সমানে চলেছে।'

তবে বিপ্লববাবুর কথার মধ্যে নতুনত্ব আছে। কোনো বস্তু আগেও ছিল— এমন প্রমাণ থাকলে বলা যায়:

পরের উদ্ভাবনটি নতুন নয়। বিপ্লববাবু যুক্তিটি ঠিক উল্টো এখন যেহেতু কমপিউটর আছে, অতীতে অবশ্যই তা ছিল। বর্তমানেই অতীতের প্রমাণ; অতীত দিয়ে বর্তমান প্রমাণ করার দরকার নেই।

বিপ্লববাবুর মতো লোকদের মনের গড়ন এমনই যে যুক্তি বা তথ্য সেখানে কোনো দাগ কাটতে পারে না। তাই বেকার সে-চেষ্টা না-করে কটি তথ্য নিবেদন করি। সরল বিশ্বাসে যাঁরা বিপ্লববাবুদের কথা মেনে নেন তাঁদের উদ্দেশেই কথাগুলো বলা।

উদ্ভাবনের বিশেষত্ব : ধারাবাহিকতা

বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার ইতিহাসে দেখা যায়: অনেক বছর ধরে সন্ধান ও পরীক্ষা চালিয়ে একটি-একটি করে সত্য জানা যায়; তার ভিত্তিতেই নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন হয়। অর্থাৎ গতিটা কম-জানা থেকে বেশি-জানার দিকে। প্রাথমিক ধরণের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি থেকে উন্নততর যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার হয়। মহাভারত-এর যুদ্ধ হয়েছিল, তারই বর্ণনামতো, তীর ধনুক, বর্শা বল্লম আর গদা দিয়ে। এসবই হলো অতি প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র। তখন বারুদের ব্যবহার জানা ছিল না, তাই বন্দুক, রাইফেল এমনকি কামানেরও দেখা মেলে না। অন্যান্য দেশে এক-এক করে এই উদ্ভাবনগুলি হওয়ার আরও অনেক অনেক শতক পরে লেখা, পড়া ও শোনার কাজে কমপিউটরের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। এ সবই বিশ শতকের ব্যাপার।

এরই মধ্যে উদ্ভাবন হয়েছে টেলিগ্রাম, বেতার, টেলিফোন ও দূরদর্শনের। এদের কোনোটির কথাই মহাভারত-এ নেই, রামায়ণ বা কোনো উপনিষদেও নেই (যে বইগুলোর কথা বিপ্লববাবু বিশেষ করে বলেছেন)।

তাহলে কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ কমপিউটর এসে পড়ে কী করে? একদিকে নব্য প্রস্তর যুগের সব হাতিয়ার, অন্যদিকে একা সঞ্জয়ের বেলায় কমপিউটর, তথ্যপ্রযুক্তি, উপগ্রহ মারফত যোগাযোগ ইত্যাদি আসবে কী করে?

দিব্যচক্ষু-র রহস্য

মহাভারত-এর কোথাও যদি এমন কোনো ইঙ্গিত থাকত— অন্তত ঝাপসা কোনো আভাস— যার থেকে অনুমান করা যায় যে, তথাকথিত দিব্যদৃষ্টির পেছনে কোনো যান্ত্রিক কৌশল রয়েছে, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু, হায়, ভীষ্মপর্বে ঘটনাটা অন্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর ছেলে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিতে চাইলেন, যাতে তিনি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিজ চোখে দেখতে পান। ধৃতরাষ্ট্র তাতে রাজি হলেন না; জ্ঞাতিদের মধ্যেকার যুদ্ধ তিনি দেখতে চান না, তবে শুনতে চান। তাঁর সদাসঙ্গী ছিলেন সঞ্জয় নামে এক সূত (সঙ্কর জাতীয়)। ব্যাস তাঁকেই দিব্যচক্ষু দিলেন। তার ফলে সবকিছু তিনি দেখতে পাবেন, এমনকি অন্যে যা মনে মনে ভাবছেন তাও জানতে পারবেন (ভীষ্মপর্ব, অধ্যায় ২)।১

দিব্যচক্ষু দান ব্যাপারটাই অসম্ভব। গাঁজাখুরি গল্প বলতে এ রকম ঘটনাই বোঝায়। দ্যাখবার বিষয় এই যে, এর সঙ্গে কোনো 'টেকনিক'-এর সুদূরতম যোগও নেই। ইচ্ছে করলেই এমন ক্ষমতা কাউকে দেওয়া যায় না।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুলাভ— এটি কোনো অনন্য ব্যাপার নয়। গীতা (ভীষ্মপর্বরই অন্তর্গত)-য় দেখা যায়: অর্জুন স্বচক্ষে কৃষ্ণর আসল রূপ দেখতে চান। কৃষ্ণ বললেন: চর্মচক্ষু দিয়ে সে-রূপ দেখা যায় না [কারণ তাতে চোখ ঝলসে যাবে]। অর্জুনকে তাই তিনি দিব্যচক্ষু দিচ্ছেন (দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। গীতা ১১.৮)। এখানে কোনো 'টেকনিক'-এর কথা নেই, আছে সেই অতিলৌকিকতা। যদি হাতের কাছে গীতা না-থাকে তবে ভীষ্মপর্ব অধ্যায় ৩৫-এ অর্জুনের বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা দেখুন।

মহাভারত-এর আরও একটি জায়গায় (আশ্রমবাসিক-পর্ব, অধ্যায় ২০) আবার এই দিব্যচক্ষুর কথা এসেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রমুখ বনে চলে গেছেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন নারদ, পর্বত, দেবল ইত্যাদি রাজর্ষি আর ব্যাস ইত্যাদি কয়েকজন সিদ্ধপুরুষ। অন্ধ রাজাকে আশ্বস্ত করে নারদ বললেন: আমার দিব্যচক্ষুর প্রভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি বিদুর ও সঞ্জয় স্বর্গলোকে যাবেন।

অর্থাৎ দিব্যচক্ষু দিয়ে শুধু বর্তমান নয়, ভূত-ভবিষ্যৎ সবই দেখা যায়। যা এখনও ঘটে নি তাও নারদ দেখতে পান। আর দ্যাখার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে?

ঐ আশ্রমবাসিক-পর্বরই অধ্যায় ৩২-এ দিব্যদৃষ্টি নিয়ে শেষ গল্পটি পাওয়া যায়। ব্যাস সবাইকে গঙ্গার তীরে জড়ো হতে বললেন। তিনি নিজে অবগাহন করে যুদ্ধে নিহত কুরু-পাণ্ডবদের যাবতীয় বীর ও রাজাকে ডাক দিলেন। জলে আলোড়ন তুলে ভীষ্ম থেকে ঘটোৎকচ, অভিমন্যু সকলেই তাদের ভূতপূর্ব বেশবাস, বাহন ইত্যাদি সমেত দেখা দিলেন। এবার বেদব্যাস তপোবনে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ও চোখে-ফেট্টি-বাঁধা গান্ধারীকে দিব্যচক্ষু দান করলেন। এবারে আর ধৃতরাষ্ট্র কোনো আপত্তি করলেন না। পরমানন্দে তিনি ও গান্ধারী বীরদের নিজ চোখে দেখলেন আর যারপরনেই তুষ্ট হলেন।২

দিব্যচক্ষু-র অস্থায়িত্ব

মানে দাঁড়াল এই যে, দিব্যচক্ষু ব্যাপারটি ব্যাস বা সঞ্জয়ের একচেটে নয়, নারদ ও ধৃতরাষ্ট্র তার ভাগ পেয়েছেন। আর প্রত্যেকবারেই অলৌকিক ক্ষমতা বা তপোবনের কথা এসেছে। কোথাও কোনো 'টেকনিক'-এর কথা আসে নি।

যাঁরা শেষ কবে মহাভারত পড়েছেন তা মনে করতে পারেন না, বা কোনোদিনই পুরোটা পড়েন নি (এমনকি সারানুবাদেও না), তাঁদের অবগতির জন্যে জানাই: দিব্যদৃষ্টিদান ব্যাপারটি সর্বদাই সাময়িক, অস্থায়ী। সৌপ্তিক-পর্ব, অধ্যায় ৯-এ দেখা যায়: ধৃতরাষ্ট্রকে ভর্ৎসনা করে সঞ্জয় বলেন: আপনার কুমন্ত্রণাই কুরু-পাণ্ডবদের সেনাক্ষয়ের মূল কারণ। আজ আপনার ছেলে স্বর্গে গেলেন, আর তার সঙ্গে ঋষিদত্ত দিব্যদৃষ্টিও নষ্ট হলো।৩

কোন্ ঐতিহ্য গৌরবের?

ভারতের অতীত নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে: পাণিনির মতো ব্যাকরণবিদ্, চরক ও সুশ্রুত-এর মতো চিকিৎসক ও শল্যশাস্ত্রবিশারদ, আর্যভট, ভাস্করাচার্যর মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানী— এঁরাই ভারতের আসল গৌরব। তার বদলে উদ্ভট গল্পকথায় আজ প্লাস্টিক সার্জারি, কাল কমপিউটর আবিষ্কার করে আমাদের দেশনেতারা বিশ্ববাসীর কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠছেন— এটাও কি তাঁরা বোঝেন না? এই ধরণের লোকজন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই কবে বিদ্রূপ করেছিলেন। প্রতিরোধ (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পা., উৎস মানুষ ১৯৯১)-এ তাঁর 'প্রত্নতত্ত্ব' (১২৯৮ ব.)-র একটি নমুনা ছাপা হয়েছে। কিন্তু কে তাঁর কথায় কান দেয়! অতীতে ধর্মান্ধরা বলতেন: প্রাচীন ভারতেও গ্যালভানিক ব্যাটারি ছিল, এখন বলেন: কমপিউটর ইত্যাদি সবই ছিল। নতুন ব্যাপার এই যে রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়ে রঙ্গ করতেন; তাঁর উত্তরসূরিরা এখন (প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়) 'চুম্মেরে' বসে আছেন।

টীকা:

১. পাঠক-পাঠিকা যাতে উৎস মিলিয়ে নিতে পারেন তার জন্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত মহাভারত–এর পর্বনাম ও অধ্যায়-সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত-এর আরও অনেক সংস্করণ আছে। সেগুলির সঙ্গে অধ্যায়-সংখ্যা সর্বদা মিলবে না।

২. মহাভারত-এর প্রামাণিক সংস্করণ (বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর প্রমুখ সম্পাদিত., পুণা: ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৩৩-৬৬)-এ এই মর্ত-র অধ্যায় ৪০-এ শ্লোক ১৭-১৮-র পাঠ একটু আলাদা। 'প্রামাণিক সংস্করণ' বলতে বোঝায়: ভারতের সব অঞ্চলের নানা লিপিতে (দেবনাগরী, বাঙলা, তামিল, তেলুগু ইত্যাদি) লেখা পাঠ মিলিয়ে সম্পাদিত সংস্করণ। মহাভারত-এর মতো রামায়ণ-এরও এমন একটি ক্রিটিকাল টেক্সট বা ক্রিটিকালি এডিটেড টেক্সট বেরিয়েছে বরোদা-র ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে।

৩. সঞ্জয় যে কোনো কমপিউটর নন, নেহাতই রক্তমাংসর মানুষ— তা বোঝা যায় সৌপ্তিক-পর্ব-র পর থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর উল্লেখ থেকে।

পু. খবরের কাগজের বিবরণে জানা গেল ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল নাকি মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সায় দিয়েছেন। প্রোটোটাইপ না-থাকলে নাকি কোনো উদ্‌ভাবন হয় না। কথা হলো: বাষ্পচালিত জাহাজ, ডুবোজাহাজ, শব্দর চেয়ে দ্রুতগামী বিমান থেকে শুরু করে নিউক্লিয় অস্ত্রশস্ত্র— এদের কোন্ টির প্রোটোটাইপ অতীতে ধরাধামে ছিল?

কৃতজ্ঞতাস্বীকার: শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত ও গোপা বসু।

উমা

বখে যাওয়ার সেকাল একাল

অরুণালোক ভট্টাচার্য

বখা কথার আভিধানিক অর্থ হল— কুসংসর্গে নষ্ট হওয়া বা বয়ে যাওয়া বা দুশ্চরিত্র হওয়া। অন্যান্য মানসিক বা চারিত্রিক বিচ্যুতির যেমন আঙ্কিক কোনো ব্যাখ্যান হয় না, বখে যাওয়ার ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকমই। সমাজ, স্থান এবং কালের নিরিখে তার সংজ্ঞা পাল্টে যায়। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে মূলত বঙ্গসমাজ এবং বিগত এক শতাব্দী সময়কাল ধরে। শুরু করি শিবনাথ শাস্ত্রীমশাইয়ের লেখা দিয়ে। তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ে রামতনুর কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় চলে আসার কারণ হিসাবে লিখছেন— 'তখন অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। তরলমতি বালকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত, যাহা তাহাদিগের জানা উচিত নয়। সুতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতে পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের বালকদিগের সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। এরূপ অনুমান হয় যে, পিতা মাতা দেখিতেন যে তাঁহাদের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও সন্তান পল্লীর বালকদলে মিশিত এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষা করিত,যাহা তাহার জানা উচিৎ নয়।' এ কিন্তু তো এক ধরনের বখে যাওয়ার আশঙ্কা। রামতনু ১৮২৬ সালে কলকাতা চলে এলেন। মনে রাখতে হবে, কলকাতা তখন ব্রিটিশদের হাতে সদ্যোনির্মীয় মাণ এক বন্দর-নগরীমাত্র। সেখানে কাজকর্মের সুযোগ অনেক বেশি। শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য আস্তে আস্তে সেখানে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যায়তন, সমাগম ঘটছে বহু বিদ্বজ্জনের। সেইসব বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভ করতে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিশোর এবং যুবকেরা কলকাতায় এসে থাকতে শুরু করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখছেন—'গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জনশীল হইলে, তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অনেকে একে একে আসিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসায় আশ্রয় লইতেন। অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে, এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত সহজেই অনুমেয়। বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকির মধ্যে বাস করিয়া তাহারা অকালপক্ক হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহা জানা উচিত নহে তাহা জানিত ও তদনরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিঁতে কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত; এবং অনেক সময় তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।' 'যে বয়সে যা জানা উচিৎ নয়'— বিধিনিষেধের এই যে ধূসর সীমারেখা, সেটি পেরিয়ে গেলেই সমাজ মনে করত যে, সে বখে গেল। বখে যাওয়ার এইসব নির্ণায়ক মাপকাঠি ছিল একদিকে অঙ্গবস্ত্র, সজ্জা ও কেশবিন্যাস, অন্যদিকে আচার-আচরণ, জীবনযাপনের পদ্ধতি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইসব মাপকাঠি এখনও বিদ্যমান। আমজনতা যখন মালকোঁচা মারা ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন ফিনফিনে কালো পাড়ের ধুতি পরলে, সেটি বাবুয়ানির লক্ষণ হিসাবেই পরিগণিত হত। পরবর্তীতে যখন প্যান্ট বা ট্রাউজার পরার প্রচলন হল, তখনও

কিন্তু প্যান্টের কিছু স্টাইলকে একটু বাঁকা চোখে দেখা হত। যেমন ধরুন চোঙা প্যান্ট বা মস্ত ঘেরের বেল-বটম প্যান্ট, বা স্কিন টাইট-প্যান্ট বা অধুনা হৃৎস্পন্দন বাড়ানো কোমরের বিপজ্জনক জায়গায় কোনওক্রমে ঝুলে থাকা লো ওয়েস্ট প্যান্ট। এগুলো কালক্রমে ফ্যাশনের মূলস্রোতে ঢুকে পড়লেও, প্রাথমিক অবস্থায় এগুলি কিন্তু বখে যাওয়া বা অকালপক্কতার নিদর্শন হিসাবেই ধরা হত। উপরের লেখা থেকে আমরা আরও দেখতে পাই যে, উঠতি যুবকদের আপাত ভাবমূর্তি নির্ণয়নে কেশসজ্জার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিগত দুই দশকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পাল্টেছে। মানুষ এখন অনেক বেশি বিশ্বায়িত। ফলত চুলের রকমারি স্টাইল বা সজ্জাকে আজ অতটা খারাপ চোখে দেখা হয় না, যতটা দেখা হত আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বা একশো বছর আগে। 'বাঁকা সিঁতে' যে খুব সোজা চোখে দেখা হত না, তা শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের লেখায় স্পষ্ট। পরবর্তীতেও অ্যালবার্ট কেটে বা টেরি বাগানো চুলের বিন্যাসকে সামাজিকভাবে ভালো চোখে দেখা হত না। আমরা দেখতে পাই যে, বড় বড় লোকেদের বা বিখ্যাত লোকেদের চুলের স্টাইল নকল করাটা একটা ফ্যাশান। বিশেষ করে নব্যযুবকেরা এই ধরনের ফ্যাশনে বেশি আকৃষ্ট হতেন। সদ্যপ্রয়াত বিখ্যাত কার্টুনিস্ট শ্রী চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর 'চলমান প্রসঙ্গ' বইয়ে লিখছেন, 'ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর নামে কফি হাউসের বাড়িটার নাম অ্যালবার্ট হল। মাথার চুলের একটি স্টাইলের নাম হল অ্যালবার্ট টেরি। প্রিন্স অ্যালবার্টের সেই 'সামনে চড়াই' চুলের স্টাইল তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। আর চুলের এই স্টাইল দেখাবার জন্যে তিনি টুপি পরতেন না'। সামাজিকভাবে কমবয়সিদের রীতিবর্জিত এই কেশবিন্যাসকে ভালোত্বের মাপকাঠির বাইরে ভাবা হত— কিছুটা বখে যাওয়ারও। তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে নজরে এল, ষাটের দশকে আমেরিকায় যে ড্রেস কোড ছিল, তাতে চুলের বাঁ দিকে সিঁথি এবং পিছন দিকে ও পাশের দিকে সরু হয়ে নেমে যাওয়া ও পরিষ্কার করে কামানোকে রীতি বলে মানা হত। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে ডাক'স টেল (duck's tail) স্টাইল খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা, এলভিস প্রিসলির মতো জনপ্রিয় তারকাদের অনুসরণ করে উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজের পড়ুয়াদের একাংশ প্রায়শই অভিভাবক এবং স্কুল-কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতেন। পরবর্তীকালে শাম্মি কাপুর প্রায় ষাটের দশকে এই কেশসজ্জাকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় করেন। আমাদের দেশের যুবকরাও শাম্মি কাপুরের ফ্ল্যামবয়েন্স অনুকরণ করতে গিয়ে সমাজের চোখে বখে যাওয়ার দিকে একধাপ এগিয়ে যেতেন। প্রায় ঐ সময়ে বা একটু পরের দিকে উত্তমকুমারের চুলের স্টাইল বা পরবর্তীকলে রাজেশ খান্না বা অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তীর কেশবিন্যাস যুবসমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ফিল্মি হিরোদের অনুকরণ করা চুলের স্টাইল কোনওভাবেই তথাকথিত সুবোধ বালকের লক্ষণ বলে মনে করা হত না, বরং তাকে বখে যাওয়ার নির্ণায়ক হিসাবেই দেখা হত।

'বাঁকা সিঁতে' যে খুব সোজা চোখে দেখা হত না, তা শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইয়ের লেখায় স্পষ্ট। পরবর্তীতেও অ্যালবার্ট কেটে বা টেরি বাগানো চুলের বিন্যাসকে সামাজিকভাবে ভালো চোখে দেখা হত না।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম বখে যাওয়াদের পোশাক এবং কেশসজ্জা নিয়ে। যুগে যুগে বখে যাওয়ার মাপকাঠির নির্ণায়ক সূচকগুলি বদলে গেলেও, নেশা করাটা কিন্তু বরাবর বখে যাওয়ার অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক। শাস্ত্রীমশাইয়ের লেখার সূত্র ধরে দাঁতে মিশি লাগানোর ব্যাপারটা বিশদে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। মিশি হল তামাকচূর্ণ, হিরাকস দিয়ে তৈরি মাজন বিশেষ। এক সময়ে আমাদের দেশে ধারণা ছিল যে, তামাকের ঔষধী গুণ আছে। দাঁত পরিষ্কার রাখা, দন্তশূলের উপশম, কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অম্ল— এই সবে নাকি তামাক খুব কাজে দেয়। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে দাঁত সাদা রাখার জন্য তামাকের সঙ্গে চুন মিশিয়ে মাজনের ব্যবহার ছিল কলকাতার বাবুদের ফ্যাশন। তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে বখে যাওয়া নব্যযুবকেরাও দাঁতে মিশি লাগানোর নেশায় পড়তেন। হুতোম তৎকালীন কলকাতার বাঙালিকে চারভাগে ভাগ করেছেন— ১) বড়মানুষ, ২) দালাল ও মোসাহেব ৩) বেকার জয়কেতু ৪) শিল্পী বা বাইজি, খেমটাওয়ালি, কবি, যাত্রাওয়ালা, বৈষ্ণব গোঁসাই, পুরুত প্রভৃতি। তৃতীয় দলের মানে হুতোম বর্ণিত 'বেকার জয়কেতু'র বেশিরভাগই শহরের বেকার যুবক দল। এদের অনেকে লেখাপড়া জানা, আবার কেউ কেউ মূর্তিমতী মা। ব্যক্তিগতভাবে এঁরা প্রত্যেকেই আজকালকার যুবকদের মতো বিশেষ আদর্শে আস্থাবান, বিশেষ বিশেষ দলে বিভক্ত। অর্থাৎ এরা মোটামুটিভাবে গোখুরি, ঝকমারি এবং পক্ষীর দলে বিভক্ত। মত্ত অবস্থায় এদের আচার-আচরণ বোঝার জন্য হুতোম বর্ণিত দুটি লাইনই যথেষ্ট— 'এরা ইয়ার বন্ধু নিয়ে স্নানে যেতে গিয়ে বাজারের মেয়ের অভাবে ঘরের পিসিকে সহযাত্রিনী করে।... মত্ত অবস্থায় বৃদ্ধ পিতাকে আহত করে মাকে সান্ত্বনা দেয়— 'ও ওল্ড ফুল মারা যাক না কেন, একে আমরা চাই নে, এবারে মা, এমন বাবা এনে দেব যে, তুমি, নতুন বাবা ও

আমি একত্রে তিনজনে বসে হেল্‌থ ড্রিংক করবো'। তৎকালীন বঙ্গসমাজে বখে যাওয়া যুবকদের আচার-ব্যবহার সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন হুতোম তাঁর এই বিবরণে। এই প্রসঙ্গে টেকচাঁদ ঠাকুরের লেখা পক্ষীর দলের কার্যকলাপ পড়লে মালুম হয়, কিভাবে অকর্মণ্য বা নৈরাশ্যের দুঃখে বিষাদগ্রস্ত মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে বখে যেতে পারে। পক্ষীদের সভার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'পক্ষির দলের আর[২] পক্ষিরাই সর্বদাই ডানা ধরিত। চরস, গাঁজা, গুলি, ছররা ও চন্ডুতে তাহাদের মুন্ড দিবারাত্র ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে,''মধুরেণ সমাপয়েৎ'' মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহুমূল্য সুধা কোথা হইতে আসবে? সুতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত...'। নেশা করার এইরকম আসর বা ঠেক সে যুগেও ছিল, আজও আছে। বখে যাওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন যুবকের অভাব কোনওকালেই নেই। মানসিক গ্লানির শিকার মানুষ সবসময়ই হয়, সে অপ্রাপ্তির হতাশাই হোক বা বৈভবের দিশাহীনতাই হোক। সে টেকচাঁদের জয়হরি বা শরৎ চাটুজ্জের দেবদাস বা হালফিলের কানাডিয়ান তারকা জাস্টিন বিবার— সকলেই সমসাময়িক সামাজিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বখে যাওয়া মানুষ। টেকচাঁদ রচিত জয়হরি চরিত্রটি কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ এক মানুষ, তার 'কালেজি দোস্ত' ফলহরি শর্ম্মার সঙ্গে এমন একটি জায়গায় চলে যান, যেখানকার লোকদের দেখে তাঁর প্রাণ ঠান্ডা হবে। জায়গাটি হল বাগবাজারের বিখ্যাত পক্ষীদের আখড়া। তারপরে কী হল, সেটি টেকচাঁদ ঠাকুরের লেখায়— 'পক্ষিরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হস্তে নাড়া বাঁধিয়া ওস্তাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান টোন ধরণ ধারণ কাটা ছেঁড়া ঢেলা সাজা এক মাত্রা দুই মাত্রা শিখাইয়া অবশেষে পূর্ণমাত্রা ধারণ করাইল। তখন পাগড়ি ঙ হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল, এত দিনের পরে আমি একজন হইলাম, কিন্তু দলস্থ কয়েকজন প্রাচীন পক্ষী তাহাকে অর্ধরথি বলিয়া গণ্য করিত-সময়ে২ তাহারা বলিত ,তুমি কিছুদিন কপচাও আজও তোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেখাপড়া- কি খেলাদুলা- কি নেসা- কি অঘোরপান্থি-কি দুষ্কর্মে, সকলেতেই মান অপমান বোধ হয়। আমি সর্ব্বোপরি হইব, এ ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, এক২ টানে কলিকা পটাস্ ২ করিয়া ফাটিতে লাগিল,তখন পক্ষিরা বলিল, হাঁ বাবা এত দিনের পরে তুমি একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে।' অতঃপর জয়হরি নেশায় ডুবে গিয়ে সংসারধর্ম শিকেয় তুলে বখে যাওয়ার আদর্শ উদাহরণস্বরূপ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন। বখে যাওয়ার উপকরণ হিসাবে তথাকথিত নেশা করার জিনিস যুগে যুগেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মদ গাঁজা থেকে শুরু করে এলএসডি ট্যাবলেটের হাত ধরে একদম হালফিলের ম্যাজিক মাশরুম। কিন্তু তামাককে ঠিক মাদকদ্রব্য বলা যাবে কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতেই পারে। সাধারণভাবে তামাকের ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও ধূমপানকে বিশেষভাবে সামাজিকভাবে গর্হিত বা বখে যাওয়ার লক্ষণ হিসাবে দেখা হত। সহজলভ্য এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্য হওয়ার জন্য অল্পবয়সে ধূমপানের অভ্যাস সহজে গড়ে ওঠার একটা প্রবণতা থেকেই যায়। খেলাচ্ছলে শুরু করার পরেই, তামাকের বশ্যতা স্বীকার করে অনেকেই সেই অভ্যাস থেকে আর ফিরতে পারে না। সমাজ এই অভ্যাসকে মান্যতা দেয় না বরং তির্যক দৃষ্টিতেই দেখে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত অগ্রজদের সামনে ধূমপান করা, তাঁদের অসম্মান করার নামান্তর বলে মনে করা হত। স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক দিকটা বাদ দিলেও, সামাজিকভাবে ছোটদের ধূমপানের অভ্যাসকে কুঅভ্যাস বা বখে যাওয়ার লক্ষণ বলেই মনে করা হত। সুকুমার রায় তাঁর খাই খাই কবিতায় লিখছেন— 'জল খায়, দুধ খায়, খায় যত পানীয়, জ্যাঠাছেলে বিড়ি খায়, কান ধরে টানিয়ো'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'পায়ের তলায় সর্ষে' বইয়ে লিখছেন— 'তারপর, সেখানকার ইসকুলে বিমল বলে গোঁফকামানো বখা ছেলের সঙ্গে ভাব হল, সে আমায় ছাদের ট্যাংকের পাশে বসে সিগারেট খাওয়া ও আরও সব অসভ্যতা শেখাতে লাগল, তার সঙ্গে আমি দুপুরে টিফিন পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া শুরু করলুম।'— বখাটে ছেলের গুণাবলীর একদম সঠিক বিবরণ। আজকের দিনে অবশ্য ধূমপান করাকে বখে যাওয়ার লক্ষণ বললে ছেলে মেয়ে সবাই মিলে রে রে করে উঠবে। ক্যান্সারের কারণ হিসাবে ধূমপানের বিধিনিষেধকে আর কে পাত্তা দিচ্ছে?

এতক্ষণ আমরা মানুষের বহিরঙ্গ যেমন বস্ত্র বা কেশসজ্জা,কিছু অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করলাম। এবারে যুগের বা সময়ের নিরিখে কিছু দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করব, যার ভিত্তিতে বখাটে স্বভাব নির্ণায়িত হত শুধুমাত্র সেই সময়কালের গণ্ডীর মধ্যেই। যেমন ধরুন, গান গাওয়া বা শোনা, সিনেমা বা নাটক করা বা দেখা। আজকের যুগে গান গাওয়া বা শোনাকে বখে যাওয়ার লক্ষণ বললে, সেটিকে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। কিন্তু বছর পঞ্চাশেক আগেই মুক্তি পাওয়া 'দেয়া নেয়া' ছবির কিছু সংলাপ মনে করাতে চাই, যেখানে পিতা কমল মিত্র বলছেন, গান কেবলমাত্র শহরের লোফার এবং নোংরা বাঈজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উত্তরে পুত্র উত্তমকুমার বলেছিলেন যে, গান সম্বন্ধে তাঁর পিতার ধারণা ভুল। লক্ষণীয় গান গাওয়া এবং তাকে সম্মানীয় পেশা হিসাবে গ্রহণ করার এই যে বিবর্তনের সূত্রপাত তখন হচ্ছিল, তা আজ, প্রায় পাঁচ দশক পরে নতুন চেহারা নিয়েছে। আজ মানুষ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো পেশা ছেড়ে গানকে সম্বল করে সমাজে হিরোর মর্যাদা পাচ্ছেন।

(বাকি অংশ পরের সংখ্যায়)

ভারতের কারিগরি-দক্ষ কর্মীরা কি আমেরিকায় অনভিপ্রেত?

শৈবাল কর

উত্তর ঠান্ডা-যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে, আমেরিকার সিদ্ধান্ত তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীন এবং ভারতের উত্থানের পরে যদিও পৃথিবীকে আর আমেরিকাকেন্দ্রিক একমেরু শক্তি হিসেবে বিচার করা চলে না, তবুও আর্ন্তজাতিক চুক্তি এবং সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমেরিকার পছন্দ যে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পায়, তা স্বতঃসিদ্ধ। আমেরিকার সুবৃহৎ অর্থনীতি, ঈর্ষণীয় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ, শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতায় অবিসম্বাদী নাম, এই বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক আলোচনার টেবিলে আমেরিকাকে খানিকটা সুবিধে করে দেয়, সাধারণত। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আমেরিকার কাছ থেকে সবথেকে বেশি অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে এবং তার ফলে যে দেশে এই দুই আর্থিকভাবে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের আগমন ঘটে, সেখানে আমেরিকার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তেরও প্রবেশ ঘটে খানিকটা অবাধে এবং খানিকটা আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে আসা চুক্তি অনুসারে। এর পুরোটাই অনভিপ্রেত বা অপ্রয়োজনীয় তা বলা চলে না। আমেরিকার অর্থনীতি যে দক্ষিণপন্থী দর্শনে সাধারণভাবে বিশ্বাসী এবং যে বিশ্বাসের সঙ্গে বাজার ব্যবস্থার সম্পর্ক ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে কর্মদক্ষতার ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে যে দেশগুলি বাজার ব্যবস্থায় আস্থা রাখত না, বা বাজার থাকলেও সরকারি হস্তক্ষেপের মধ্যে দিয়ে তা ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করত, সেখানে উৎপাদনশীলতা এবং বহু বিষয়ে দক্ষতা বা মুন্সিয়ানার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। এর অন্যতম কারণ হল, তুলনামূলকভাবে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার অঢেল সুবিধে এবং সারা পৃথিবীর বহু উন্নত মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের একত্রিত হওয়ার প্রভাব শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে তাই নয়, উন্নয়নের ধারণাকেও পরিবর্তন করতে সাহায্যে করে। অনেক দেশ, এমনকি ইউরোপের অনেক সু-উন্নত দেশও অবশ্য উন্নয়নের এই ধারণার সঙ্গে সহমত নয়। তবে আমেরিকার উন্নয়ন তত্ত্ব বা দর্শনের পরিবর্তে, উত্তর ইউরোপের কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রগুলোর পদ্ধতি যে কোনো কারণেই হোক অন্য দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হতে পারে নি। উচ্চহারে ধার্য করা মাথাপিছু কর একটা কারণ হতে পারে। ছোট দেশ, অল্প সংখ্যক লোক, রাজনৈতিকভাবে সুস্থির, যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, এই কারণগুলোও সম্ভবত উন্নয়নের এই ধারণাকে আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে সহজে প্রবেশ করতে দেয় নি। উত্তর-বিশ্বযুদ্ধ এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির সম্যক অবস্থান বিভিন্ন রকম; লোকসংখ্যা, দারিদ্র্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, এক রকম নয়। এমনকি উন্নত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যেও বহু পার্থক্য। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের পদ্ধতি গ্রহণ করতে গেলে আরো একটি প্রয়োজন সম্ভবত রোজগারের সমতা। রাষ্ট্রের ধার্য করা ৫০% প্রত্যক্ষ কর এবং অপ্রত্যক্ষ কর দিতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট না হলে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রায় বিনা পয়সায় গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দিতে পারত না বলেই মনে হয়। পৃথিবীব্যাপী বহুবিধ পরিবর্তন হওয়ার পরেও অধিকাংশ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক পরিবেশ এর অনুকূল নয়। খোদ আমেরিকাতে গরিব মানুষের সংখ্যা লোকসংখ্যার ১৫ শতাংশ। সুতরাং কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের উন্নয়ন পদ্ধতি বাদ দিলে পড়ে থাকে পূর্ণ বাজারভিত্তিক উন্নয়নের যুক্তি এবং দর্শন, অথবা ভারত এবং অন্য কিছু দেশে জনপ্রিয় মিশ্র অর্থনীতি। দুটি ক্ষেত্রেই যে অনেক সমস্যা রয়েছে তা বহু আলোচিত। পুরোনো সোভিয়েত রাশিয়ার মতন শুধু সরকারি ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে এমন দেশ ইদানীং অমিল।

আমেরিকার ব্যবসায়ীরা বাজার বিষয়ে যতটা আস্থাশীল, তেমনটি অন্য দেশে পাওয়া শক্ত। চীন-ভারতে, বাংলাদেশে কি মেক্সিকোতে যদি সস্তায় উপাদান কিনতে পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সেখানে নিয়ে চলে যেতে আমেরিকার স্থায়ী উৎপাদকের একটুও দ্বিধা হবে না। কারণ শ্রম বাজারে নির্ধারিত হওয়া মাইনে সেখানে কম এবং আমেরিকায় বেশি, তা যে কারণেই তা ঘটে থাকুক না কেন। এই দেশগুলি যদি কারিগরি

দক্ষতাতে কিছুটা কমজোরি হয় তাহলেও অসুবিধে নেই। কারণ মার্কিন ব্যবসা সরাসরি সেখানে গিয়ে ব্যবসা করে আসবে। এতে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য, আর তার ফলে স্থায়ী বাসিন্দাদের অনেকে চাকরিও খোয়াতে পারেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেছিলেন, আমেরিকার চাকরি দেশে ফেরত নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখিয়ে। এবং আমেরিকাকে মার্কিনদের জন্য নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সুতরাং, এই বিষয়ে সরকারি নীতি কোন দিকে যেতে পারে তা বলা শক্ত নয়। এইচ-ওয়ান বি ভিসা ভারতের কারিগরিদক্ষ কর্মীদের জন্য পুরো বন্ধ না হলেও, সংখ্যায় কমে যাবে এটি ঘোষিত। আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ার হতে চাওয়ার ব্যাপারে বেশ অনীহা দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে। দেশে যথেষ্ট চাকরি নেই, আর আমেরিকার দরজা আধখোলা, এটি একটি কারণ হতেই পারে।

আরেকটি বিষয়ের সঙ্গেও এটির যোগ ঘনিষ্ঠ। মেক্সিকো থেকে প্রতি বছর এক লক্ষের বেশি বেআইনি অনুপ্রবেশকারী আমেরিকায় চলে আসেন বলে অভিযোগ। এরা শুধু মেক্সিকোবাসী নন; দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অনেকেও আসেন। অনুপ্রবেশকারীর মোট সংখ্যা এক কোটির কিছু বেশি। আমেরিকা বড়লোক দেশ বলেই যত খুশি বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে বিনা প্রশ্নে সেখানে থাকতে দেবে এমন মনে করার কারণ নেই নিশ্চয়। আমেরিকার মধ্যে যারা মুক্ত এবং ভীষণ রকম স্বাধীন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারাও মনে করেন যে সীমাসুরক্ষা দল যে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর উপর গুলি চালাচ্ছে না এটাই তো উন্নত গণতন্ত্রের পরিচয়। কিন্তু যে কোনো শহরে স্থান সঙ্কুলান না হলে, কিম্বা সরকারি দ্রব্য-পরিষেবা দানের ক্ষেত্রে সরকার যদি স্থায়ী আইনি বাসিন্দা এবং বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, তাহলে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। তবে, এই বিষয়ে সরকারি নীতি নিয়ে আলোচনা বা তর্কের সুযোগ রয়েছে, কারণ কিছু মার্কিন ব্যবসায়ী সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় বলে এর স্বপক্ষে সওয়াল করে থাকেন। গত কয়েক বছরে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরাও নাকি প্রত্যক্ষ কর জমা দিয়েছেন কয়েক হাজার কোটি ডলার। দুঃখের বিষয় সরকারি রেকর্ডে এঁদের নাম নথিভুক্ত না থাকার দরুণ সরকার বুঝতেই পারেনি, কে কত কর জমা দিয়েছেন। ফলে, এর সাহায্যে আমেরিকায় বসবাস করার স্থায়ী অধিকার পাওয়া যাবে কিনা সেটি একেবারেই নিশ্চিত নয়। এঁদের অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আইনগতভাবে অভিবাসী হতে চাওয়া দক্ষ কর্মীদের বিষয়টি।

তত্ত্বগতভাবে, বিদেশের মাটিতে উৎপাদন নিয়ে যাওয়া আর বিদেশি কর্মীকে দেশে কাজ করার ছাড়পত্র দেওয়া একে অপরের পরিপূরক। এর আন্তর্জাতিক এবং অন্তর্দেশীয় প্রভাব কিছুটা আলাদা। তবে দু ক্ষেত্রেই কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মীদের চাকরি চলে যেতে পারে। বিদেশি কর্মীরা সরাসরি চাকরি পেলে আমেরিকার শ্রম বাজারে নির্ধারিত মাইনে পাবেন। তা যদি স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রাপ্য মাইনের সমান হয় তাহলে মার্কিন কর্মী এবং বিদেশি কর্মীরা পরস্পরের পরিবর্ত হিসেবে কাজ করবেন। অন্যথায়, কী ধরনের দক্ষতা অভিবাসীরা নিয়ে আসছেন, তার প্রভাবে সম্পর্কটি পরস্পরের পরিপূরকও হতে পারে। অভিবাসীরা প্রধানত স্কল্প দক্ষতার হলে বোধ হয় অসুবিধে কম, কারণ যে ধরনের কাজ উন্নত দেশের অধিবাসীরা সচরাচর করতে চান না, সেগুলোতে এদের নিয়োগ করলে কারো কোথাও আপত্তির সুযোগ থাকে না। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় নার্সের চাকরি, মধ্যপ্রাচ্যে রাজমিস্ত্রি, যান্ত্রিক কাজে দক্ষ শ্রমিক, গৃহকর্মী, ইত্যাদি চাকরি নিয়ে আপত্তির কথা শোনা যায় না বিশেষ। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে সাফাইকর্মীরা অধিকাংশ ভারতীয় এবং বহুদিন যাবৎ। কই, তার জন্য ইউরোপের ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ইংল্যান্ড ঘোষণা করেনি তো এতদিন? তাহলে নতুন করে কোন দেশপ্রেম একদিকে ট্রাম্প এবং অন্যদিকে ইংল্যান্ডের মানুষকে আরো অন্তর্মুখী করে তুলেছে? আগের বক্তব্যে ফিরে এসে বলতে হয় যে, উচ্চ দক্ষতার বিদেশি কর্মী দেশের চাকরি নেবে এই ভয়েই অভিবাসন নীতি প্রবর্তনের নতুন তাগিদ অতলান্তিকের দুই পারে। তাহলে কি সমান দক্ষ বা দক্ষতর স্থানীয় অধিবাসীর অভাব ঘটেছে আমেরিকায় এবং ইংলন্ডেও? বিষয়টি আশ্চর্যের এবং চিন্তাজনকও বটে। যে দেশে উচ্চশিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য রকমের বেশি, কম্পিউটার দক্ষ মানুষের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ, তাদের থেকে ভারত-চীনের কিছু মানুষ বেশি দক্ষ? অসম্ভব নয়, কারণ ভারতের ছাত্রছাত্রীরা যারা যথাযথ সুযোগ পেয়েছে আর তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে, তারা পাতার পর পাতা কেমিস্ট্রির ফর্মুলা বা অঙ্কের উপপাদ্য মুখস্ত বলতে পারে। আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা পারে না, কারণ তাদের ওভাবে শেখানো হয় না। অধিকাংশের মধ্যে পাঠ্যবইয়ের মলাট থেকে মলাট মুখস্থ করার কোনো তাগিদ বা প্রয়োজন থাকে না। কারণ চাকরির বাজার শুধু পরীক্ষার শংসাপত্র দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নিয়মের বাইরে গিয়ে ভাবতে পারার, স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতাকে পুরস্কৃত করে শ্রমবাজার। তবে, নতুন নতুন পদ্ধতি বা চিন্তাধারা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপকার যে একদিন কমে যেতে পারে তা অনুভব করার প্রয়োজন আছে। সেদিন, সমস্ত পদ্ধতি যার মুখস্থ বা হস্তগত, তার দাম বাড়বে। স্বাধীন চিন্তাবিদের দাম কমে যাবে না, কিন্তু দাম পাওয়ার জন্য তার অপেক্ষার সময় বেড়ে যাবে। অর্থনীতির বিচার এমনটাই নির্দেশ করে বলে বিশ্বাস। ফলে, আবিষ্কার নিত্যনতুন ঘটে চললেও লক্ষ্য দেখা যাবে যে, ফেসবুক বা টুইটারও কিন্তু এক দশক পার করে ফেলেছে। রোজই তো নতুন জুকেরবার্গ জন্মাচ্ছে না। যা তৈরি

হয়ে গিয়েছে তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও হস্তগত করা কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন, চিন্তাবিদ্ একটু কম হলেও ক্ষতি নেই। এর আগে ভাটিয়ার তৈরি প্রথম হটমেল-এর বেশ কিছু পরিবর্ত বাজারে আসার দরুন, হটমেল, আমেরিকা অনলাইন এবং তার সঙ্গে একাধিক সার্চ-ইঞ্জিন গুগুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাভূত হয়ে বাজার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিং সলোমনস মাইন উপন্যাসে সাদা মানুষদের মারতে চাওয়া ছোট্ট ডাইনির নাম ছিল গাগুল, তা হয়ত অনেকের স্মরণাতীত নয়! যাই হোক্, বড় ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতা অসম্ভব হলে যে ব্যবসায়িক গবেষণা বা উদ্ভাবন বন্ধ হয়ে যায়, তা একেবারেই নয়। উদ্ভাবক অনেক ক্ষেত্রেই পদ্ধতিগত এবং কখনো উৎপন্ন সামগ্রীর সম্পূর্ণ লাইসেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে বড় ব্যবসাকে। এর বাবদ রোজগার লালমোহনবাবু যাকে 'টু-পাইস' বলতেন, তার কয়েক হাজার কোটি গুণ। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর যে শহর থেকে সবথেকে বেশি পেটেন্ট পাওয়ার অনুরোধ গৃহীত হয় বাৎসরিক হিসেবে, তা আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো, সিয়াটল কিম্বা বস্টন নয়। এই শহর, হল্যান্ডের আইন্ডহোভেন, যেখানে বিখ্যাত ফিলিপস কোম্পানির মস্ত অফিস। এর থেকে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে যে, নতুন কারিগরি দক্ষতার উন্নয়নে কারা বেশি হারে যুক্ত এবং কারা আবিষ্কৃত মেশিন চালু রাখার কাজে। সে কাজ যদি অঙ্ক মুখস্থ করা ভারতীয়-চীনা কর্মীরা বেশি দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে তাহলে অভিবাসীদের হাতে স্থানীয়দের পরাজয় ঘটবে, তা বলাই বাহুল্য। তার প্রতিঘাতে ট্রাম্প যে বিদ্বেষমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, তাও একরকম নিশ্চিত। অথচ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্বাস, যা ট্রাম্পের হাতে আরো বেশি করে প্রসারিত হবে বলে তিনি নিজে এবং অন্যরাও মনে করেন আমেরিকায়, তা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বক্তব্য পেশ করে এসেছে পুরোনো এবং নতুন গবেষণার মধ্যে দিয়ে। এর অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী, যাঁর দক্ষিণপন্থী ধারণা গোপন থাকেনি বিভিন্ন গবেষণাপত্রে আর রচিত পুস্তকে, অনেক আগেই কিন্তু প্রমাণ করেছেন যে, পুঁজির স্বার্থে মুক্ত অভিবাসন আমেরিকার পক্ষে সুবিধাজনক।

সংখ্যার বিচারেও আমেরিকাতেই সবথেকে বেশি অভিবাসী বসবাস করেন। এঁদের মোট সংখ্যা চার কোটি সত্তর লক্ষ বা আমেরিকার জনসংখ্যার ১৪.৪%। ভারতের তিনটি বড় শহরের মিলিত জনসংখ্যা এর থেকে বেশি। অবশ্য তাতে কি? বড় দেশ বলেই সেখানে মাথা ঠোকাঠুকি করে বাস করতে হবে? উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে ফুটপাথে ব্যবসার জবরদখল এবং রাস্তায় রাস্তায় সংসার পাতা খাপ খায় না কোনোভাবেই। আমেরিকার ফুটপাথেও লোক থাকে। দেশের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ বেশ গরিব। তবে অনেকের জন্যই কোনো-না-কোনো সরকারি ব্যবস্থা আছে, যেমন আমাদের রেশনের মতো ফুড-স্ট্যাম্প। রাত্রে থাকার জন্য মাথাগোঁজার ঠাঁইও রয়েছে বেশ কিছু শহরে। যাই হোক, বিভিন্ন রকমের আর্থিক বৈষম্য নিয়ে চলতে থাকা আমেরিকাতে বহুদিন আগেই দেখানো হয়েছে যে, দেশে অভিবাসীদের আসতে দেওয়া অর্থনৈতিকভাবে উপকারী, আর দেশ থেকে পুঁজি বিদেশে নিয়োজিত হলে তার ফল সুবিধাজনক নয়। এই তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে এই প্রবন্ধটি শেষ করব।

ধরা যাক, দুটি দেশের মধ্যে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য প্রচলিত এবং পুঁজি ও শ্রমের গতায়াত রয়েছে। এই দুটি দেশ যথাক্রমে আমেরিকা ও মেক্সিকো। আমেরিকাতে পুঁজির মোট পরিমাণ শ্রমিকের তুলনায় বেশি। মাথাপিছু পুঁজি মেক্সিকোর তুলনায় বেশি হওয়ার দরুণ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা এবং রোজগার দুই-ই বেশি। অভিবাসনের প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ধরন অনুযায়ী মেক্সিকো থেকে শ্রমিক আমেরিকাতে আসবে বেশি রোজগারের আশায়। অন্যদিকে মেক্সিকোতে যেহেতু পুঁজি তুলনামূলকভাবে অমিল, আমেরিকার ব্যবসায়ী সেখানে এক ডলারের পুঁজি বিনিয়োগ করলে দেশের থেকে বেশি হারে সুদ পাওয়ার কথা। প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যতত্ত্ব অনুসারে পুঁজির রোজগার এবং শ্রমের রোজগার দু দেশে সমান হয়ে যাবে এর ফলে, কারণ পুঁজির প্রাচুর্য যে দেশে, সেখান থেকে অন্য দেশে বিনিয়োগ হলে দেশে পুঁজির ওপর উপলব্ধ সুদ বাড়তে থাকে। একই যুক্তিতে শ্রমিকের প্রাচুর্য থাকায় এবং গরিব দেশে উদ্বৃত্ত শ্রম তো স্বাভাবিক, মেক্সিকো থেকে শ্রমিকেরা আমেরিকায় পাড়ি দিলে দেশের মধ্যে তাদের মাইনে বাড়া উচিত। যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক দেশ ছেড়ে চলে গেলে মেক্সিকোতে মাইনে আমেরিকার সমান হয়ে যেতে পারে, অন্তত তাত্ত্বিক তর্কের বিচারে। সম্পর্কটি খুব কষ্টকল্পিত নয়। ভারতে সফ্টঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুদক্ষ কর্মীদের রোজগার, ভারতে প্রচলিত দরদামের নিরিখে প্রায় আমেরিকার সমানই। এর ফলে দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যদি পুঁজিপ্রধান আমেরিকার বশে থাকে, তাহলে আমেরিকার পক্ষে সহায়ক হবে যদি যথেষ্ট মেক্সিকোবাসীকে আমেরিকাতে আসতে দেওয়া হয়। বেশি শ্রমিক এলে আমেরিকার পুঁজিপতিরা প্রচুর উৎপাদন বাড়াতে পারেন এবং শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুণ প্রত্যেকের রোজগার কমে যায়। পুঁজিপতিদের কাছে এ তো পরম প্রাপ্তি। অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের রোজগারও কমে যায় এর ফলে। কিন্তু পুঁজিপতিরা সস্তায় শ্রমিক ব্যবহার করতে পারলে দেশি-বিদেশির মধ্যে পার্থক্য করেন, এমন তো মনে হয় না। ট্রাম্পের বাড়ি তৈরির যে প্রধান ব্যবসা তাতে অধিকাংশ কর্মী

মেক্সিকো থেকে আসেন। ২০১১র পর প্রকাশিত তথ্য বলছে, বিশ্বব্যাপী মন্দার কারণে বাড়ি তৈরির ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এঁরাই চাকরি হারিয়েছেন সর্বাগ্রে। এদিকে পুঁজি যেহেতু কোথাও যাচ্ছে না আমেরিকা ছেড়ে, ফলে যাঁরা ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চান অথবা সম্প্রসারণ করতে চান, তাঁদের পৌষমাস। পুঁজির প্রাচুর্য থাকায় নামমাত্র সুদে তাঁরা ঋণ নিতে পারেন ব্যাঙ্ক থেকে। শ্রম এবং পুঁজির এই মিশেল আমেরিকার কাছে 'উইন-উইন' একটি সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক বুঝতে না পারার মতো ব্যবসায়ী ট্রাম্প নন। তাহলে রাষ্ট্রপতি হয়ে সত্যিই কি তাঁর দেশপ্রেম এতটাই গভীর হয়ে পড়েছে যে ব্যবসায়ীরা যেটা নিশ্চিত জয়ের চাবিকাঠি বলে মনে করেন সেটাই তাঁদের হাত দিয়ে কেড়ে নিচ্ছেন? নাকি আসলে এর পিছনে আরো উগ্র দক্ষিণপন্থী কোনো প্রভাব কাজ করছে? সাধারণত আমেরিকাতে যারা চাকরি পান না, তাঁদের জন্য কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় সাহায্যের বন্দোবস্ত রয়েছে। বিদেশিদের আটকে দিয়ে, দেশের চাকরিবিমুখ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুৎপাদক শ্রমিককে শ্রমের বাজারে ঠেলে পাঠিয়ে ট্রাম্প হয়ত এই রাষ্ট্রীয় সাহায্যগুলো বরাবরের মতন বন্ধ করে দিতে চাইছেন। যেহেতু বর্ণবৈষম্যের রাজধানী দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসকেরাও এটি করতে চেয়েছিলেন এক সময়ে, ফলে অর্থনীতির ঐতিহাসিকেরা কিন্তু জানেন যে, তার ফলে কত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সে দেশে। শুধুমাত্র বৈষম্য সৃষ্টি করার তাগিদে আমেরিকাও সেই পথে হাঁটলে তার ফল যে বিপরীতে যাবে অচিরেই, সেটা ব্যবসায়ী ট্রাম্প জানেন কিনা সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। উমা

নিরামিষ খাবার কতটা স্বাস্থ্যরক্ষা করে

গৌতম মিস্ত্রী

ভারতীয়দের নিরামিষপ্রীতি বিশ্বব্যাপী সুবিদিত। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও এই অভ্যাসের অন্য কারণ আছে, যেটা মূলত সুস্বাস্থ্যের কামনায়। কারণ যাই হোক না কেন, স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে যাঁরা ঐচ্ছিকভাবে নিরামিষ খাচ্ছেন, কেউ কেউ কৃচ্ছ্রসাধন মনে করে নিরামিষ খেয়ে চলেছেন, তাঁদের জন্য একটা দুঃসংবাদ দেবার কারণেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকানিবাসী ডাক্তার "এনাস এ এনাস" সর্বপ্রথম আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে অস্বাভাবিক বেশি সংখ্যায় (আমেরিকানদের চেয়ে চারগুণ) ও অত্যধিক তীব্রতার 'করোনারি আরটারি ডিজিস' বা চলতি কথায় হৃদরোগের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন। কেবল তাই নয়, তিনি খেয়াল করেন, শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে ভারতীয়দের মধ্যে হৃদরোগ শুরুও হয় তুলনামূলকভাবে কম বয়সীদের। প্রৌঢ় এই চিকিৎসক বিজ্ঞানী তার পুরো কর্মজীবন আমেরিকায় ও ভারতে ভারতীয়দের হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের রহস্যভেদে অতিবাহিত করেছেন ও এখনও করে চলছেন। হৃদরোগ যে নিবারণযোগ্য সেই ধারণার ও তৎসম্পর্কিত প্রচুর কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারি তিনি। তাঁর এক বিখ্যাত উক্তি "আমরা আমাদের বাবা-মা বেছে নিতে পারি না। আমরা, ভারতীয়রা অধিক মাত্রায় হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মাই। ভারতীয়দের শরীর যেন একটা কার্তুজ ভরা বন্দুক। কেবল ট্রিগার টেপার ঘটনাটা ঘটতে না দিলেই দুর্ঘটনা আটকানো যাবে।" আমরা ট্রিগার টেপার রূপকের ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়— খাদ্যনির্বাচন নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। ভারতীয়দের নিরামিষ খাবার আসলে "দূষিত নিরামিষ খাদ্য", ডাক্তার এনাসের কথায় "Indian vegetarian diet is in fact a contaminated vegetarian diet"— কী সাংঘাতিক উক্তি!

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে বিশ্বের মানুষের খাদ্যরুচি ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমে আমরা সুস্থ থাকার জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারদাবার সম্বন্ধে জানা ও বিতর্কের ঊর্ধ্বের তথ্যগুলি একবার খতিয়ে দেখব। এইখানে মানবশরীরের ইনসুলিন প্রস্তুতকারী অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আমাদের খাবারের প্রধান অংশ হল শর্করা, যেটা কিনা পেট থেকে রক্তে ঢোকার সময়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়েই তবে ঢুকতে পায়। রক্তে গ্লুকোজের ঊর্ধ্ব মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলিনের ডাক পড়ে। খাবারে বেশি শর্করা থাকলে আনুপাতিক হারে বেশি করে ইনসুলিন তৈরি করতে হয় অগ্ন্যাশয়কে। এই ব্যাপারটা ক্রমাগত হতে থাকলে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন প্রস্তুতকারী বিটা কোষের মান ও পরিমাণ কমতে থাকে। অগ্নাশয়ের বিটা-কোষের কর্মক্ষমতা কমে গেলে, পরবর্তীকালে ইনসুলিন জোগানে ঘাটতি পড়ে। একদিকে ইনসুলিনের জোগান কমে যাওয়া, আর একই সঙ্গে স্থূল হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা কমে যাওয়ায় দ্বিমুখী আক্রমণে

শুরু হয়ে যায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নিরাময়ের অযোগ্য ক্রনিক রোগসমূহ। অর্থাৎ শৈশবে অস্বাস্থ্যকর মাত্রায় শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাসের কারণে মাঝবয়সে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি ফেইলিওর, ব্রেন স্ট্রোকের মত অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলি জনিত রোগের সম্ভাবনা তিনগুণ বেড়ে যাবে বলে বৈজ্ঞানিকগণ সতর্ক করছেন। স্নেহের আতিশয্যে শিশুদের রসগোল্লা, পায়েস, কেক-কুকিজ, চকোলেট, আইসক্রিম, হরলিক্স, আলুর চিপস ইত্যাদি উপহার দেবার সময় আমরা খেয়াল করি না, আসলে আমরা ঐ আদরের শিশুদের সর্বনাশ করে চলেছি সেই বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকেই।

ভারতীয়দের খাবারে, বিশেষত নিরামিষ খাবারে, দুঃখজনকভাবে শর্করা বেশি থাকায় নিরামিষাশীদের অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষের মৃত্যু ঘটতে থাকে শৈশব থেকে। শৈশবে শরীরের আকার আয়তন কম হওয়ায় এই আঘাত প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে বেশি। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয়দের শরীরে মাংসপেশি কম আর চর্বি বেশি অর্থাৎ ভারতীয়রা সারকোপেনিক (sarcopenic,YYParadox, http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(03)15269-5.pdf)। নিরামিষ খাবারের থালায় আমিষের বিকল্প হিসাবে যে সকল খাদ্যবস্তু দিয়ে খাবারকে আকর্ষণীয় ও ভক্ষণযোগ্য করে তোলা হয় সেটা পাশ্চাত্যের নিরামিষের খাবারের থালার চেয়ে আলাদা। বিভিন্ন ধরনের ভাজাভুজি, তাজা সবজির রকমফের হিসাবে কোপ্তা, ছানা, পনির, দই, মিষ্টি পায়েস ইত্যাদি ভারতীয় নিরামিষ খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য খাবারের থালায় শোভা পায়। ডুবো তেলে কড়া করে ভাজা শর্করা জাতীয় খাবার আর চিনি ও বিভিন্ন রূপে সরল শর্করা ভারতীয় নিরামিষ খাবারের এক মুখ্য অংশ। তেলে ডুবিয়ে ভাজা খাবারে স্নেহ জাতীয় খাদ্যাংশ অক্সিডাইজড হয়ে যায়, যেটা রক্তের অস্বাস্থ্যকর লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরলের (low density lipoprotein cholesterol) মাত্রা বাড়ায়। পাশ্চাত্যের নিরামিষ খাবারে স্যালাড, সিদ্ধ বা বেক্‌ড বিন্‌স, কাঁচা বাদাম, সুষম পরিমাণের জটিল শর্করা, বিভিন্ন ধরনের বেরি ও ফলের প্রচলন আছে। অর্থাৎ ভারতীয় নিরামিষ খাবার হল শর্করাসমৃদ্ধ খাবার, যেখানে পাশ্চাত্যের নিরামিষ খাবার ফাইবার ও তাজা ভিটামিনে ভরপুর, শর্করার ভাগ কম। কম শর্করার খাবারের প্রয়োজনটা আমরা অভ্যাসে পরিণত করে নিতে পারি নি। এর ঐতিহাসিক কারণটা অর্থনৈতিক হলেও আধুনিক সচ্ছল ভারতীয় শর্করাসমৃদ্ধ খাবারের আসক্তি কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

ভারতীয়দের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা অন্য জনজাতির চেয়ে বেশি। ট্রাইগ্লিসারাইড এক ধরনের ফ্যাট, যেটা রক্তে থাকে আর মাত্রাতিরিক্ত হলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। বৈজ্ঞানিকগণের অনুমান, জিনগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ভারতীয়দের শর্করা-প্রীতি এর এক অন্যতম কারণ। শ্বেতাঙ্গদের এই ঝামেলা নেই। তাই উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের সমস্যা ভেদে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বড় অভাব। আমরা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের জন্য এখনও শ্বেতাঙ্গদের অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল। কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে তার প্রমাণসিদ্ধ চিকিৎসাপ্রযুক্তি আছে। উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইডের প্রামাণ্য চিকিৎসা নেই। একক যে ওষুধটি উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ন্ত্রণ করে, সেটি হৃদরোগ কমায়, এমন প্রমাণ নেই। অতএব ভরসা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের। নিরামিষ খাবারে সেই অবসর কোথায়?

খাবারে রদবদল করে রোগের বোঝা কমানো যায় কি?

বিগত তিন দশক ধরে উন্নত দেশগুলো খাদ্য সংস্কৃতির স্বাস্থ্যকর করার চেষ্টায় সচেষ্ট হয়ে প্রায় ৫০% হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে সক্ষম হয়েছে। ফিনল্যান্ড, আমেরিকা, ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড এর জ্বলন্ত উদাহরণ। গ্রিনল্যান্ডের ইনুইট, ভূমধ্য সাগরকূলের ক্রেটে দ্বীপ আর জাপানের ওকিনাওয়ান-এর বাসিন্দাদের রোগহীন আয়ু ঈর্ষনীয়ভাবে বেশি। সামাজিক ও রাষ্ট্রের উদ্যোগে আম জনতার খাবারে নুন, চিনি, সম্পৃক্ত ফ্যাট, ট্রান্স-ফ্যাট ও সরল শর্করা কমানো এর মূলসূত্র। ভারতীয় নিরামিষের থালায় ঐ খাবারগুলো বাদ দিলে খালি থালাটি পড়ে থাকে। আমরা যখন ডিমসিদ্ধের বদলে ডাব্‌ল ডিমের ওমলেট খাই, তখন দৈনিক কোলেস্টেরলের নির্দেশিকা মতে ভক্ষণযোগ্য কোটার (দৈনিক ৩০০ মিলিগ্রাম) চেয়ে দ্বিগুণ কোলেস্টেরল খাই। মনে রাখতে হবে, এই কোলেস্টেরল কেবল ডিম থেকেই আসে না, বরং ওমলেটের ভাজার তেল এই কোলেস্টেরলের বেশিরভাগটা সরবরাহ করে, সেটাও তেলের অস্বাস্থ্যকর অক্সিডাইজ্‌ড অবতারে।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার উৎপাদনে আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের থেকে বেশ এগিয়ে। ডেয়ারি শিল্পের অগ্রগতির সাথে হৃদরোগের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক আছে, যদিও তার কার্য-কারণের সম্পর্কটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় নি। জীবজগতের অন্যান্য জীবদের পাচনপ্রক্রিয়া অনুধাবন করে বোঝা যায়, শৈশবের পরে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দুধ হজম হওয়ার কথা নয়। জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শৈশবের পরে দুধ হজমকারি অন্ত্রের ''ল্যাক্টেজ'' উৎসেচকের উৎপাদন ফুরিয়ে যাবার কথা। যাদের শৈশবের পরে এই উৎসেচকের অভাবে ''ল্যাক্টেজ ইনটলারেন্স'' নামক সমস্যা হয় আর দুধ খেলে ডায়ারিয়া হয়, তাদের আসলে স্বাভাবিক জিনের সুস্থ প্রভাবে দুধ পান থেকে বিরত থাকার ইঙ্গিত দেয় মানবশরীর। আমরা, যারা, এই জেনেটিক প্রোগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ অর্জন করেছি, কেবল তারাই দুধপান করে (সম্ভবত) হৃদরোগের সমস্যা আহ্বান করি। প্রসঙ্গত দুধে যে ফ্যাট থাকে, মানে যেটা না থাকলে দুধের স্বাদ ঘোলের মত জোলো হয়ে যায়, সেটা অস্বাস্থ্যকর সম্পৃক্ত ফ্যাট। নিরামিষাশীগণ আমিষের বিকল্প হিসাবে প্রোটিনের জন্য দুধ ও দুধ থেকে তৈরি অন্যান্য খাবারের উপরে নির্ভর করেন।

নিরামিষ খাদ্যের থালায় আমিষ খাদ্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশি তেল থাকে। মাছ, মাংস, ডিমের পরিবর্তে ভাজা খাবার— যেমন আলুভাজা, বেগুনভাজা, পকোড়া, কোপ্তা, বড়া ইত্যাদি নিরামিষ খাবারের থালার স্বাদবর্ধক পদ। খাবারের পাতে তেল থাকবে না এমন অযৌক্তিক কথা বলছি না। যে মুহূর্তে সবজিটি ভাজা হল, সেই ক্ষণে সবজির জলের ভাগ বেরিয়ে গেল আর অক্সিডাইজ্ড তেল দ্বারা সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে গেল। এতে খাবারের কেবল স্বাদ বাড়ল তাই নয়, রান্নার পরে ভাজা খাবার বহুক্ষণ অবিকৃত থাকার আকার পেয়ে গেল। খাদ্যবস্তু আরও শক্তিঘন (ক্যালোরি ডেন্স) হয়ে পড়ল। শস্যদানায় দেখা যায় না, এমন তেলের অংশ শতকরা ৩ থেকে ৫ শতাংশ। সেই জন্য আমিষভোজী মানুষের খাবারের থালায় আলাদা করে তেলের প্রয়োজন থাকে না। ভারতীয়দের খাবারে আলাদা করে জৈব তেল না মেশালেও শস্যদানা থেকে দৈনিক ৪০ থেকে ৬০ গ্রাম তেল পাওয়া যায়, যেটা দৈনিক কোটার সমান। নিরামিষভোজীদের খাবারের থালার ভাজা খাবার মাধ্যমে প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশি তেল পেটে ঢুকে পড়ে।

কাঁচা তেল বনাম ভাজা তেল

ইদানীং মিডিয়ার দৌলতে অনেক পুরানো তথ্য নাটকীয়ভাবে পেশ হওয়ার ফলে আমাদের অনেক আধাখেঁচড়া জ্ঞান অর্জন হয়ে গেছে— যেমন ডিমে কোলেস্টেরল নেই, জৈব তেল আসলে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভালো ইত্যাদি। ডিমের কথা এখন থাক। তেলের ব্যাপারে পশ্চিমী দুনিয়া যেটা পুঁথিপত্রে লিখছে সেটা সব কিন্তু কাঁচা তেলের স্বপক্ষে। ভাজা তেলের কথা ওদের ভাববার দায় নেই। ওঁরা ওটা খান না। কন্টিনেন্টাল ডিশের জৈব তেল সবই কাঁচা— স্যালাডে মেশায়। যে মুহূর্তে গরম কড়াইতে পড়ে তেল ধুমায়িত হল অথবা মাইক্রোআভেনে কিংবা বেকারির গরম করা হল, আর সেইক্ষণে তেল বাতাসের অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে সেটা হৃদরোগের উপাদানে পরিণত হল (অ্যাথেরোজেনিক)। মহামান্য পাঠক-পাঠিকা, আমি বেগুনভাজা, আলুভাজা, হরেক রকমের বড়া, তেলেভাজা, চানাচুর, শিঙ্গাড়া, চপ-কাটলেট, পরোটা, এগ বা মাটন রোল, মাছভাজা, লুচি-পুরি এইসবের কথাই বলছি। এগুলো সর্ষের তেলে ভাজা, না সূর্যমুখীর তেলে এই আলোচনা একদমই অকাজের। গরম কড়াইতে সূর্যমুখীর তেল আর বনস্পতির মধ্যের ফারাকটা কেবল দামেই বটে। তবে এরই মধ্যে পাম অয়েল, নারকেল তেল আর বনস্পতি কাঁচা অবস্থাতেই সম্পৃক্ত তেলে ভরপুর, অর্থাৎ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

স্বাস্থ্যকর খাবার তবে কী?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদের অপেক্ষাকৃত কম সুসভ্য জনজাতির খাদ্যাভ্যাসের খোঁজখবর করতে হবে। কারণ, তাদের জীবনশৈলী এখনও সভ্যতার (?) বিষে বিষাক্ত হয়নি। এঁদের দীর্ঘ স্বাস্থ্যকর ও রোগমুক্ত জীবন মানবজাতির ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন খাদ্যাভ্যাসের বিনা পয়সার বিজ্ঞাপন। এঁদের খাবারের থালা খুঁটিয়ে দেখলে দেখব— (১) তন্তুসমৃদ্ধ, জটিল শর্করার শস্যদানা (২) কাঁচা বাদাম (৩) প্রচুর ফল ও তাজা রঙিন সবজি (৪) সামুদ্রিক মাছ (৫) সামুদ্রিক শ্যাওলা ও (৬) চর্বিবিহীন মাংস। সমুদ্রতট থেকে যাঁরা দূরে বসবাস করেন, তাঁদের খাবারে থাকে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটওয়ালা জলপাইয়ের তেল (যেটা ভেজে নষ্ট করা হয় না) এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটওয়ালা সয়াবিনের তেল। সামগ্রিকভাবে এই ধরনের খাবার শক্তিঘন (energy dense) নয়। প্রচুর প্রাকৃতিক ফ্ল্যাভিনয়েড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভাইটামিন ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ থাকে এই খাবারে। বিশেষ করে এই খাবারে ট্রান্স-ফ্যাট, চিনি, নুন আর পরিশোধিত ও পালিশ করা চাল ও ময়দা থাকে না। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, এই খাবার, যেটা মেডিটেরানিয়ান খাবার বলেই সুখ্যাত, ৯০ শতাংশ ডায়াবেটিস, ৮০ শতাংশ হৃদরোগ, ৩০ শতাংশ হার্ট অ্যাটাক আর ৭০ শতাংশ সেরিব্রাল স্ট্রোক নিবারণ করতে পারে।

ভারতীয়দের আর শ্বেতাঙ্গদের উদরপূর্তির উপায়ের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যখন প্রাকৃতিক সম্পদে ও সালোকসংশ্লেষের অন্যতম উপাদান হিসাবে অত্যাবশ্যকীয় সূর্যকিরণের প্রাচুর্যে ভরপুর ভারতে কৃষিপ্রযুক্তি প্রসার লাভ করছিল, সেইক্ষণে পশ্চিমী দুনিয়ায় সেই পরিমাণ কৃষিপ্রযুক্তির প্রসার কঠিন ছিল। ফলে পাশ্চাত্যে শস্যদানা নয়, শিকার করা বা খামারে দেখভাল করা পশুর মাংস উদরপূর্তির রসদ হিসাবে প্রাধান্য পেয়ে গেল। ভারতীয়রা কৃষিজাত শর্করায় পেট ভরিয়ে টিকে গেল, শ্বেতাঙ্গরা পশুর মাংসের উপরে নির্ভর করে একটু সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে গেল। এর ফলে ভারতীয়দের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনের পরিবর্তন ঘটে শরীরে প্রোটিনের বদলে চর্বি দখল নিল। একই উচ্চতার ও ওজনের মানুষের শারীরিক উপাদানে ভারতীয়দের চর্বি প্রাধান্য পেল, শ্বেতাঙ্গদের প্রোটিন। এই বৈশিষ্ট্যটা ওয়াই-ওয়াই প্যারাডক্স নামে কুখ্যাত।

স্বাস্থ্যকর নিরামিষ খাবারে আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল, রঙিন (সবুজ হলদে ইত্যাদি) সবজি, পূর্ণ শস্যদানা, সয়াবিন, লেগুম ইত্যাদি ডাল জাতীয় প্রোটিন সমৃদ্ধ শস্যদানা ও বাদাম থাকার কথা, যেগুলোতে যথেষ্ট তন্তু, প্রাকৃতিক ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে। ভারতের বাইরে নিরামিষ খাবারের থালায় এই খাদ্যদ্রব্যই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য নিরামিষপ্রিয় মানুষদের

অনেকেই কেবল মাংস বর্জন করে ডিম আর মাছ খেয়ে থাকেন। এই ধরনের নিরামিষ খাবার খেলে রক্তের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ন্ত্রণে থাকে ওষুধ ছাড়াই। একটি সমীক্ষা-মতে, প্রায় অর্ধেক ভারতীয় নিরামিষাশী, যাঁরা প্রধানত আমিষের বদলে পূর্ণমাত্রার সম্পৃক্ত ফ্যাট সমৃদ্ধ দুধ ও বিভিন্ন ডেয়ারির খাদ্যদ্রব্য, চিনি ও মিষ্টি, ভাজা খাবার আর কষে রান্না করা সবজি খেয়ে থাকেন। বিশেষজ্ঞগণ এটাকে বিষাক্ত নিরামিষ খাবার বলেছেন। কারণ, এই খাবারে প্রচুর ট্রান্স-ফ্যাট, পরিশোধিত চিনি আর শস্যদানা থাকে। অনেকেরই ধারণা নেই, দুগ্ধজাত খাবারের প্রধান অস্বাস্থ্যকর বিষয়টি হল এর সম্পৃক্ত ফ্যাট। টক দই সম্বন্ধে অনেকেরই একটা অসত্য ধারণা এই যে, এটা বুঝি স্বাস্থ্যকর। ভারতের বাজারে উপলব্ধ সমস্ত ডেয়ারির খাদ্যদ্রব্য রক্তের লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরির স্বাস্থ্যকর উচ্চমাত্রা ২৫ শতাংশ হলেও নিরামিষাশী ভারতীয়দের খাবারে ফ্যাট ৫০ শতাংশের বেশি ক্যালোরির বোঝা বাড়ায়।

ধর্মীয় ও পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত বিধিনিষেধের কারণ ছাড়াও ভারতে অর্থনৈতিক কারণেও মাছ, মাংস আর ডিম জাতীয় আমিষ খাবারের পরিমাণ বেশ কম। নিরামিষাশী ও আমিষে আপত্তি নেই এমন ভারতীয়দের ৯০ শতাংশ খাবারে কোনো ফারাক নেই, যেখানে আমেরিকাবাসীদের খাবারে দৈনিক গড়পড়তা ৩৪০ গ্রাম মাংস ও ৬০ গ্রাম মাছ থাকে। মাছ এড়িয়ে চলা ভারতীয়দের খাবারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে না। এই কারণে পাশ্চাত্যদের চোখে সব ভারতীয়ই নিরামিষভোজীর সমতুল্য। কিঞ্চিৎ সচ্ছল ভারতীয়দের দৈনিক খাদ্যতালিকায় পাউরুটি, লুচি, পুরি, ভাতুরা বা পরোটার আধিক্য বেশ অস্বাস্থ্যকর। এইগুলিতে মুচমুচে ভাজা আলু বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের চেয়েও বেশি ট্রান্স-ফ্যাট থাকে। যাঁরা স্বাস্থ্যরক্ষার কারণে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পরিহার করেন কিন্তু পরোটা ততটা দোষের মনে করেন না, তাঁদের জেনে নিলে ক্ষতি নেই ১০০ গ্রাম ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ে ৫ গ্রাম ট্রান্স-ফ্যাট থাকে যেখানে ১০০ গ্রাম ভাতুরায় ট্রান্স-ফ্যাটের পরিমাণ ১০ গ্রাম। ভারতীয়দের খাদ্যরুচি বিশেষভাবে অস্বাস্থ্যকর এই কারণে যে, এতে তন্তু কম, সরল শর্করা বেশি। আমরা তেল কম খেলেও সেই তেল প্রধানত অস্বাস্থ্যকর সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাট ও ট্রান্স-ফ্যাট। কড়া করে ভাজার জন্য তাজা সবজি, যেটা এমনিতেই পরিমাণে বেশ কম, সেটাও ভাজা ও কষার জন্য তার খাদ্যগুণ হারায়। ভাজার জন্য সবজির ভাইটামিন উধাও। জৈব তেল, তা সে যে কোনো মহার্ঘ সূর্যমুখীর তেল বা জলপাইয়ের তেলই হোক না কেন, সেটা ট্রান্স-ফ্যাট ও অক্সিডাইজ্ড ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিরামিষাশীদের খাবারে তার মাত্রা বেশ বেশিই।

হৃদ্‌রোগ নিবারণে সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন এমন আমেরিকাবাসী ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত বিজ্ঞানী "এনাস এ এনাস" হিন্দু পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার দেন। সেটার এক ঝলক এইরূপ (ভারতীয় নিরামিষ খাবার আপনার হৃদয়ের সুরক্ষায় অক্ষম): http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/bei...etarian-does-not-reduce-risk-of-heart-disease/article 4441411.ece

নিরামিষ খাবার কি হৃদরোগ নিবারণে সক্ষম?

— আপনি যদি ভারতীয় হন, তবে আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব মুক্ত উত্তর— না।

রেড মিট কি অস্বাস্থ্যকর?

— (কাঁচা অবস্থায় পাঁঠা, বিফ, পর্ক ইত্যাদি, যেগুলো সাধারণত মাটন বলে পরিচিত, সেগুলোতে বেশি মায়োগ্লোবিন থাকে বলে লাল রঙের হয়। এগুলোই রেড মিট। অন্যদিকে মুরগি, অন্যান্য পাখির বা কচি শুয়োরের কাঁচা মাংস অপেক্ষাকৃত সাদা বা হোয়াইট মিট। প্রথাগতভাবে রেড মিট ক্যান্সার ও হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ায় বলে মনে করা হয়, যদিও এই মতের পক্ষে জোরালো প্রমাণ নেই)

রেড মিটের চেয়েও ভারতীয় নিরামিষ খাবার বেশি অস্বাস্থ্যকর, হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি সবার এক নয়। পারিবারিক সূত্রে কোন কোন পরিবারে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশি বলে শোনা যায়?

— ভারতীয়দের মধ্যে কম ঝুঁকির (হৃদরোগের) কোনো পরিবার হয় না। সব ভারতীয়ই হৃদরোগের অধিক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। প্রতিদিন প্রায় ৬৩০০ জন ভারতীয়ের হৃদ্‌রোগের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়, আর এঁদের মধ্যে ৪০ শতাংশের বয়স ৪০ বছরের নিচে। ভারতীয়দের মধ্যে যারা মেদভারে জর্জরিত, ধূমপানে আসক্ত ও কুঁড়ে (অ্যারোবিক ব্যায়াম করেন না) তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

তথ্যসূত্র

১) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3028947/
২) http://ispub.com/IJC/1/2/4493
৩) ttps://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/foo...s-between-diet-and-disease-in-indians/articleshow/55777084.cms
৪) http://www.cadiresearch.org/research/dr-enas
৫) http://www.cadiresearch.org/topic/diet-indian/indian-diet-overview
৬) http://www.cadiresearch.org/topic/diet-indian/contaminated-vegetarianism
৭) http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/bei...etarian-does-not-reduce-risk-of-২heart-disease/article4441411.ece

উমা

সেলুলার জেলে 'বীর' সাভারকর

প্রবীর মুখোপাধ্যায়

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভ্রমণার্থীদের অন্যতম দর্শনীয় তীর্থস্থান পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে রাখলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক হবে, ব্রিটিশ সরকারের এই ধারণা থেকেই এই জেলের পত্তন। জনবিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলে বন্দীদের ওপর অবাধে অত্যাচার চালালেও কেউ জানতে পারবে না, আর তাই তার প্রতিবাদও হবে না। সর্বোপরি সমুদ্র পরিবেষ্টিত বলে জেল থেকে পালানোও সম্ভব নয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পর থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেজন্য 'দ্বীপান্তর' বা 'কালাপানি'-র সাজা দেওয়া শুরু হয়। আজ ভারতের সকল নাগরিকের কাছে এই সেলুলার জেল এক তীর্থস্থান, যেখানে বহু বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেছেন, অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে প্রাণ দিয়েছেন, এমনকি অনেকে উন্মাদও হয়ে গিয়েছেন।

ভ্রমণার্থীদের এই জেলের বাইরে আর ভেতরে ঢুকে দেখার জন্য যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনই সন্ধ্যায় আছে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শোয়ের। দিনের বেলায় জেলের ভেতরে রাখা বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে কী ধরনের অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হত, তার আন্দাজ করতে পারা যায়। আর 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শোয়ে তার বাস্তব ছবি দর্শনার্থীদের সামনে ফুটে ওঠে। ইতিহাস আপনার সামনে উন্মোচিত হবে, এই আশা নিয়ে আমরাও সেলুলার জেল দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম, তাতে শুধু যে আশাহত হয়েছি তা নয়, বরং বিরক্তই হয়েছি এই কারণে যে, ইতিহাসের নামে যা পরিবেশন করা হচ্ছে, তা বিকৃত ও একদেশদর্শী।

যে সেল বা কুঠুরিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই সেলটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের সময়ে এই সেলের আলো জ্বালিয়ে বারবার দেখানো হয়। মনে হয় যে, এই জেলে যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজা পেয়ে এসেছেন, বিনায়ক সাভারকারের স্থান তাঁদের মধ্যে অনন্য ও শ্রেষ্ঠতম।

কিন্তু ইতিহাস কী বলে?

সাভারকর সেলুলার জেলে এসেছেন ১৯১১ সালের ৪ জুলাই আর বোম্বাই রওনা হয়েছেন ১৯২১ সালের ২ মে। অর্থাৎ উনি সেলুলার জেলে ছিলেন মাত্র দশ বছরের থেকেও তিন মাস কম সময়ের জন্য। বহু বহু বিপ্লবী এর থেকে বেশি সময় ওখানে জেলে ছিলেন। এমনকি ওঁরই বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকারও ১২ বছর ঐ জেলে বন্দী ছিলেন। ১৯০৯ সালে মানিকতলা বোমা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বারীন ঘোষ ও অন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ১৯০৯ সালে এখানে আসেন ও ১৯২১ সালে সাধারণ অ্যামনেস্টি ঘোষণার পর দেশে ফেরত আসেন। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২৮ এপ্রিল ১৯১২ ইন্দুভূষণ রায় আত্মহত্যা করেন। ঐ একই কারণে উল্লাসকর দত্ত উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় ওঁকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ১৯১৩ সালে। হেমচন্দ্র দাসকেও ১৯২০ সালে ফেরত পাঠানো হয়।

বিনায়ক সাভারকার ১৯১০ সালে গ্রেপ্তার হন, ১৯১১ সালে ব্রিটিশ আদালতের বিচারে তাঁর দু দফায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়, যার মোট মেয়াদকাল ছিল পঞ্চাশ বছর। দশ বছরের আগেই ব্রিটিশ সরকার হঠাৎ দয়াপরবশ হয়ে সাভারকারকে কেন ছেড়ে দিল?

আন্দামানে আসার আগে অবধি সাভারকার তিনজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। সাভারকার যে কত বড় বিপ্লবী ছিলেন, তার প্রমাণ হিসাবে এগুলিকে তুলে ধরা হয়। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের মামলায় সাভারকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট ছিল, যদিও যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তিনি ছাড়া পান। এইসব ক্ষেত্রেই একটি প্রমাণিত বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন— এইসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অন্যদের উৎসাহ, প্ররোচনা ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে সহায়তা করলেও নিজেকে প্রত্যক্ষ অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সাভারকার। যাঁদের দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড করা হয়েছিল, তাঁদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসে আর তাঁর ভাই গোপাল গডসে এই অভিযোগ সরাসরি করেছেন।

সহকর্মীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আন্দামানে বন্দী থাকার সময়ে। ত্রৈলোক্য মহারাজের লেখা থেকে জানা যায় যে, বন্দীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সবাইকে অনশন আন্দোলনে সামিল হতে বলেও নিজে কিন্তু সেই আন্দোলনে সাভারকার সামিল হন না। আসলে দ্বীপান্তরের সাজা ঘোষণার পর থেকেই তাঁর হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। আন্দামান পৌঁছনোর আগে থেকেই তাই শুরু হয়ে যায় সরকারের কাছে

আবেদন-নিবেদনের পালা।

১৯১১ সালে দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগে থেকে আর ১৯২১ সালে সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফেরা পর্যন্ত সাভারকার অনেকগুলি 'ক্ষমা প্রার্থনামূলক আবেদনপত্র' বা Mercy Petition কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ১৯১৪ আর ১৯১৮ সালে করা আবেদনপত্রে সাভারকর জানান যে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আর অংশগ্রহণ করবেন না, এমনকি যাঁরা তাঁকে নেতা হিসাবে মানে, তাঁদেরও তিনি সরকারের পক্ষে ফিরিয়ে আনবেন। দেশের স্বাধীনতা নয়, শুধু নিজের কারামুক্তির বিনিময়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী হবার মুচলেকা লিখে দিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতার আর কোনো উদাহরণ আছে কি না আমাদের জানা নেই।

ব্রিটিশ সরকারও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাভারকারকে কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দিতে শুরু করল। যেমন অন্য বন্দীদের মতন ওঁকে আর নারকেল থেকে ছোবড়া ছাড়িয়ে দড়ি বানানো বা কলুর ঘানিতে বেঁধে তেল তৈরির কাজ থেকে ছাড়িয়ে প্রথমে জেলের কেরানির কাজ দেওয়া হল। পরে জেলের 'ফোরম্যান'ও বানানো হল, বন্দীদের ওপর যে ফোরম্যানদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা সাভারকর নিজের লেখাতেই উল্লেখ করেছেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ সরকার শর্তাধীনে সাভারকরকে জেল থেকে মুক্তি দিতে পারে বলে জানাল। শর্তগুলি কী— এক, সাভারকারকে রত্নগিরি জেলার মধ্যেই থাকতে হবে, সরকারের অনুমতি ছাড়া জেলার বাইরে যাওয়া যাবে না; দুই, ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য কোনোভাবেই রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করা যাবে না; আর এই শর্তাবলি পাঁচ বছরের জন্য, মেয়াদ শেষে এগুলি পুনর্বিচার করা হবে। এর সঙ্গে আরেকটা গোপন শর্ত ছিল যেটা জানা গেল সাভারকরের মৃত্যুর অনেক পরে, ১৯৯৫ সালে, ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর। অতিরিক্ত এই শর্তটি ছিল এই যে, সাভারকার তাঁর বিচার, শাস্তি ও ব্রিটিশ আইনব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে এবং সহিংস আন্দোলনকে নিন্দা করে এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে নিজের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করবেন। সাভারকার লিখিতভাবে ঘোষণা করলেন যে, তিনি সঠিক বিচার ও যথাযোগ্য সাজা পেয়েছেন। তিনি আরও লিখলেন যে, "বিগত দিনগুলিতে হিংসাশ্রয়ী যে সব পথ আমি গ্রহণ করেছিলাম, সেগুলি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করছি, আর মনে করি যে, আইন ও সংবিধানকে অনুসরণ করা আমার কর্তব্য..." । ব্রিটিশ সরকারের সব শর্তগুলি সাভারকার মেনে নিলেন ! অর্থাৎ কলমের এক খোঁচায় ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে উনি নস্যাৎ করে দিলেন, শুধুমাত্র নিজের কারামুক্তির জন্য। কিন্তু এটা ওঁর মনে ছিল না যে, এই মুচলেকার দ্বারা উনি ওঁর নিজের এতদিনের 'বিপ্লবী' কাজকর্মকেও নস্যাৎ করলেন ! 'বীরত্ব' কাকে বলে !

এই রকম এক 'বীর'-এর বীরত্বকে সম্মান জানানোর জন্য পোর্ট ব্লেয়ারের বিমানবন্দরের নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে। ৪ঠা মে ২০০২ শনিবারের বারবেলায় অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে রামরথ-সারথি তথা ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী-তথা-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার-স্থিত বিমানবন্দরের নতুন নামকরণ করলেন 'বীর' সাভারকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সাভারকার সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন, সে কথা মনে করানোর জন্য তিনি যে সেলে বন্দী ছিলেন সেটিকে বিশেষভাবে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'তে দেখানো শুরু হল। মনে রাখতে হবে, ঐ বছরেই কিন্তু ২৭শে ফেব্রুয়ারি ঘটে গেছে গোধরার ট্রেনে আগুন লাগানো আর তার পরে পরেই গুজরাট দাঙ্গার ঘটনা।

এর কয়েকমাস পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার প্রমুখের উপস্থিতিতে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে সাভারকারের ছবির আবরণ উন্মোচন করলেন। সেন্ট্রাল হলে মহাত্মা গান্ধীর ছবিটি বিশেষভাবে বাঁধানো যে জায়গায় আছে, ঠিক তার মুখোমুখি জায়গায় এই প্রতিকৃতিটি টাঙানো হয়েছে। এই দুই সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে 'নেতা' বানানোর কাজ শুরু হয়।

সেলুলার জেলে ব্রিটিশ শাসকদের অবর্ণনীয় পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন, উন্মাদ হয়ে গেছেন, এমনকি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন বহু বহু বিপ্লবী– তবুও তাঁরা দাসখত লিখে দেননি, দালালি করার কথা বলেননি। তাঁরা 'নেতা' নন, নেতা বানানো হচ্ছে দাসখত লিখে দেওয়া এক ব্যক্তিকে। ধন্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ !

তথ্যঋণ

1. Majumdar R. C., Penal Settlement in Andamans, Gazetteers Unit, Department of Culture, Ministry of Education and Social Welfare, Government of India, New Delhi
2. Noorani, A. G., & quot; Savarkar's Mercy Petition & quot; Frontline (April 8, 2005) (The Hindu).
3. Noorani, A. G., "Savarkar and Gandhi, Frontline Volume 20 - Issue 06, 15–28 March 2003.
4. Palande, Prof M.R, ed. (1958),Source Material for a History of the FreedomMovement of India(PDF) 2, Govt of India
5. Shamsul Islam, Hindutva Savarkar Unmasked, 4 th edition 2016, Media House, Delhi

সাভারকরের রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকার কি চোখে দেখতো তার বিস্তারিত বিবরণপাওয়া যায় ব্রিটিশ সরকারের Home Department Special Volume 60 of 1908 – 1909 থেকে।]

উমা

পাখার ঝুলোঝুলি

সমীরকুমার ঘোষ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে— রোলিং স্টোনস গ্যাদার নো মস। মানে, গড়ানো পাথরে শ্যাওলা জমে না। তা যে জমে না, তার প্রমাণ হরিদ্বার (আসলে হরদ্বার) বা ওই ধরনের উঁচু এলাকার গঙ্গাতেই মেলে। রোলিং স্টোনে মস গজায় না, তো বুঝলাম, এই নিয়মে বনবন করে ঘোরা পাখার ব্লেডও ঝকঝকে পরিষ্কার থাকার কথা। সেখানে তো ঝুলেদের ঝুলোঝুলি করার কথা নয়! কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে। দিব্যি ঝুলতে থাকে ব্লেডের, মানে পাখার পাখার গা ধরে, ভিড় বাস বা ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের মতো। একেবারে প্রান্তে বেশি, ক্রমশ ভেতরের দিকে কম। মসের এই খামখেয়ালিপনার কারণ থেকেই সম্ভবত মশকরা শব্দটার জন্ম। সুনীতিবাবু বা সুকুমার সেনরা থাকলে হয়ত বলতে পারতেন।

শুধু ঘরের সিলিং ফ্যানেতেই নয়, উইন্ড টানেলের মস্ত বড় পাখা, এগজস্ট ফ্যান, টেবিল ফ্যান— সব ফ্যানেরই মস্ত বড় ফ্যান ওই ঝুল। তারকাদের সঙ্গে থাকা ফ্যানেদের মতোই পূর্ববঙ্গীয় লজ্জে 'লগে লগে ঘোরে', গায়ে গায়ে লেপ্টে থাকে। এইখানেই লাগে খটকা। বনবন করে পাখা ঘুরলে তো ওদের মাস পয়লায় হাতে পাওয়া মাইনের টাকার মতো উড়ে যাওয়ারই কথা! পাখার হাওয়ার ধাক্কায় কাগজপত্র কত কি ওড়ে অথচ ঝুলেরা দিব্যি গেড়ে বসে থাকে! এ নিয়ে যে প্রশ্নগুলো পাখার ব্লেডের মতোই মাথায় ঘুরপাক খায়, তা হল— এক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে অত ধুলো আসে কোথা থেকে! দুই, ধুলো যদি ঘরে থেকেই থাকে, তা পাখার ব্লেডে গিয়ে জমা হয় কেন এবং জমলেও ঘোরার সময় পড়ে যায় না-ই বা কেন?

প্রথমে আসি ধুলোর প্রশ্নে। আমরা যতই ঘরদোর ঝাঁট দিই বা বাইরে থেকে ধুলো আসবে না বলে দুয়ার এঁটে থাকি, ডনের মতো ধুলোকে রোখা শুধু মুশকিলই নয়, না মুমকিন। অসাধ্য। মেঝে থেকে জুতো— হাঁটাচলার কারণে ক্ষয় হয়েই চলেছে সবকিছু। দেখতে পাচ্ছি না, এই যা। তার সঙ্গে আছে ধোঁয়া, আর বাইরে থেকে আসা বাতাসের সঙ্গে অদৃশ্য ধুলোকণা। আরেকটা জিনিসের কথাও বিজ্ঞানীরা বলেন, তা হল মৃতকোষ। শরীর থেকে প্রতি নিয়ত খসে পড়ছে অসংখ্য শুষ্ক ত্বকের টুকরো। একটা-দুটো নয়, লক্ষ লক্ষ। অদৃশ্য। ডেভিস বোডানিস বলে এক বিজ্ঞানী তাঁর 'দ্য সিক্রেট হাউস' বইতে লিখেছেন, যে ঘরে আমরা বাস করি তা ধুলোয় ভর্তি। তার মধ্যে রয়েছে প্রতি মিনিটেই হাজার হাজার টুকরো খসে-পড়া শুকনো ত্বকের টুকরো। তার সঙ্গে এই ধুলোর দল ভারী করে আণুবীক্ষণিক জীব, যাকে মাইটস বলে। ধুলোর সঙ্গে অনেক সময় নাকে ঢুকে হাঁচিয়ে মারে। আমরা বলি ডাস্ট অ্যালার্জি। ও প্রসঙ্গ থাক। বোঝা গেল, আমরা না চাইলেও ধুলোরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বহাল তবিয়তে ঘরে বিরাজ করে। ঝেঁটিয়ে তার সামান্য অংশকেই দূর করতে পারি।

স্কুলে পদার্থবিদ্যার বইতে 'স্থির তড়িৎ' বলে একটা বিষয় সবাই পড়েছি। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। সেই এবোনাইটের দণ্ড ও রেশমি রুমালের পরীক্ষাটা মনে করুন। বই যদি না খুলতে চান, শীতকালে গায়ের সোয়েটার খোলার সময় সেই চড়চড় আওয়াজ, গায়ের রোম খাড়া হওয়া, এমনকি আলোর ফুলকির কথা স্মরণে আনুন। ছোটবেলায় প্লাস্টিকের টুকরো মাথায় (তেলা মাথায়) ঘষে কাগজের কুচিকে আকর্ষণ করার খেলাটা অনেকে হয়ত খেলেছেন! (না খেললে এখনও এদিক-ওদিক তাকিয়ে একবার খেলে নিতে পারেন।)। এ সবই সেই স্থির তড়িতের কামাল। দুটো বস্তুর ঘর্ষণের কারণে তার মধ্যে চার্জ তৈরি হয়। সে বিপরীত চার্জের তড়িৎকণাকে আকর্ষণ করে। বাতাসে যে ধুলোকণা ভাসে তারও একটা চার্জ থাকে। ওদিকে পাখা যখন বাতাস কেটে ঘোরে ঘর্ষণের কারণে ব্লেডের গায়েও তৈরি হয় চার্জ। ব্লেড বিপরীত মেরুর তড়িৎকণাকে নিজের দিকে টেনে আনে। অনেকটা ফাঁকা বা জলা জায়গা যেভাবে প্রমোটরকে টেনে আনে। (পুরুষ-নারীর উদাহরণটা টানলাম না, ওটা টানাটানি করতে করতে বড্ড জোলো হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া সম্পর্কের এখন অনেক সমীকরণ!)

পদার্থবিদ্যার বই জানাচ্ছে, দুটো বস্তুর ঘর্ষণে স্থির তড়িৎ-এর

সৃষ্টি হয়। একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে বেশি বেশি ধনাত্মক (পজিটিভলি চার্জড) হয়ে ওঠে, অন্যটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক (নেগেটিভলি চার্জড) হয়ে উঠে। এর কারণ একটার বাইরের ইলেকট্রন বৃত্তে ইলেকট্রনের বাঁধন তেমন মজবুত নয়। অন্য জিনিসের বাইরের প্রকোষ্ঠে আবার অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে। তাতেই 'দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে', ইলেকট্রন আগেরটা থেকে পরেরটায় চলে যেতে পারে। এইভাবে ইলেকট্রনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। বিপরীত মেরুকে কাছে টেনে নিয়ে সে সুস্থির হওয়ার চেষ্টা করে। গড়ে ওঠে স্নেহের বাঁধন। অনেকেই খেয়াল করেছেন, যেখানে বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানো হয়, সেখানে বেলুনওয়ালা জামায় ঘষে নিয়ে দেওয়ালে বেলুন আটকে দেয়। জামায় ঘষার কারণে বেলুনের গায়ে অতিরিক্ত ইলেকট্রন যুক্ত হয়। যা ঋণাত্মক। এবার দেওয়াল বা পর্দা বেলুনের থেকে অনেক বেশি ধনাত্মক চার্জ সম্বলিত। ফলে বেলুন ও দেওয়াল কাছাকাছি আসতেই বেলুন দেওয়ালের গায়ে লটকে যায়। সেই বিপরীত মেরুর আকর্ষণের তত্ত্ব।

বেলুন ফাটিয়ে এবার ব্লেডের ঘুরপাকে ঢুকুন। তার মধ্যে গতিবিজ্ঞানের এক রহস্যও আছে। বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যান

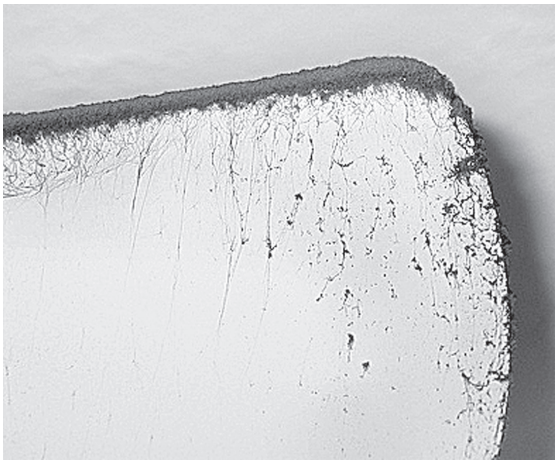

বলছেন, পাখার পাখা যত জোরেই বাতাস কেটে ঘুরুক না কেন, তার উপরিতলের লাগোয়া বাতাসের গতি হয় শূন্য। ফলে ছোট্ট ধুলোকণাগুলোর গায়ে গতির আঁচ লাগে না। তারা নিঃশব্দে এসে অবতরণ করে ব্লেডের ওপর। তারপর মেরুর টানে আটকা পড়ে। তাতেই ধুলো বা ঝুল পুরু থেকে পুরুতর হয়। ক্বচিৎ কদাচ তা থেকে খানিকটা যে উড়ে এসে পড়ে না তা নয়। সেটা বোঝা বেশি ভারী হয়ে গেলে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে পাখার ব্লেডে সব জায়গায় সমান ঝুল জমে না। ঝুল বেশি জমে ব্লেডের প্রান্তরেখায়। কেন্দ্রের দিকে ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ প্রান্তভাগের সঙ্গে বাতাসের ঘর্ষণ হয় বেশি। সেখানে চার্জও তৈরি হয় বেশি। তাই ধুলো এমনি উড়ে এসে জুড়ে বসল, ভাবলে ভুল হবে। তারা বিপরীত চার্জের টানেই গিয়ে জমা হয়। তার সঙ্গে বাতাসের যে মন্দগতির কথা আগে বলা হল, সেটাও অনেকটা সহায়তা করে।

যে ঘরে পাখা কম চালানো হয় বা একদমই চলে না, তার ব্লেডের দিকে তাকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেখানে ঝুলের ঝও পাবেন না। ঘরে ধুলো আছে। কিন্তু পাখায় গতি নেই বলে স্থির তড়িৎ নেই। বেচারা ধুলোকে আপন করে নেওয়ারও কেউ নেই।

প্রসঙ্গত, টেলিভিশন বা স্টিরিও যন্ত্রের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের গায়েও প্রচুর ধুলো জমে। তা ওই বিপরীত তড়িৎকণার আকর্ষণেই। আরেকটা বর্তমানে বহু ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলা যায়, তা হল লেজার প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন। জোরালো আলো ফেলেও স্থির তড়িতের সৃষ্টি করা যায়। আলো দিয়ে প্রথমে পাতার ওপর লেখা বা ছবির একটা ছাপ ফেলা হয়। সেই ছাপে একটা চার্জ তৈরি করা হয়। তারপর সেটা যখন কালির ড্রামের, যাকে টোনার বলে, ভেতর দিয়ে যায়, তখন তা বিপরীতধর্মী কালির কণাগুলোকে আকর্ষণ করে। এর মাঝে ইলেকট্রিক হিটিং যন্ত্রের কিছু কারিকুরি থাকে। তারা কালিকে গলিয়ে একটা নির্দিষ্ট চেহারা দেয়। আমরা দেখি ছাপা হিসেবে। স্থির তড়িৎ বহুরূপে সম্মুখে আমাদের, নানা খেলায় মত্ত।

উমা

বাঁধ বন্যা বিপর্যয়

ফি বছর বর্ষা মানেই বন্যা। বন্যা নিয়ে এর আগে আমাদের দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বন্যা এখনও প্রাসঙ্গিক। তাই সমসময়কে ধরে উৎস মানুষ প্রকাশ করতে চলেছে নতুন সঙ্কলনগ্রন্থ।

সোমা নেই

রানী ভবানী স্কুলে উৎস মানুষের আড্ডায়, ১৯৯৩ সালে। সোমা বসে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়।

ফাল্গুনী সেনগুপ্ত (১৯৬৬-২০১৮) বললে যে দূরত্ব তৈরি হয় 'সোমা' নামটা বললে তক্ষুনি তা কমে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই আশি-নব্বই দশকের উৎস মানুষের আড্ডায় নিয়মিত যোগ দেওয়া এক যুবতীর মুখ। মনে পড়ে যায় ময়দানে বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলে অশোকদার কিংবা চিত্তদার সঙ্গে খুনসুটি করা এক উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি আর সুরেলা কণ্ঠ ও খলখলে হাসি। প্রাণোচ্ছল সোমাকে ঘিরে কত স্মৃতি ! কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখি! সোমা কোনোদিনই উৎস মানুষের সদস্য ছিল না কিন্তু ও আমাদের অনেক কিছু ছিল। মনেপ্রাণে উৎস মানুষকে ভালবাসত। ভালবাসত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের। পত্রিকার দৈনন্দিন কাজে না থাকলেও উৎস মানুষের সংসারের হাঁড়ির খবর রাখত। সে আগেও যেমন, পরেও তেমন। সবার যেন ছোট বোন, তাই সোমাকে পেলেই ওর পেছনে লাগার জন্য সবাই উসখুশ করত। উৎস মানুষ সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালপ্রয়াণের পরেও যে পত্রিকা ঝাঁপ বন্ধ হয়নি, তাতে সোমার কোনো অবদান নেই, তা বলা যাবে না। ওর আবৃত্তি যারা শুনেছে, তারা জানে যে মঞ্চসফলদের চেয়ে ও কোনো অংশে কম ছিল না। বছর সাত–আট আগে হাতিবাগানে বিজ্ঞান মেলায় সোমা উৎস মানুষের বই 'নিজের মুখোমুখি' থেকে অংশবিশেষ পাঠ করেছিল তারকের (গাঙ্গুলি) সঙ্গে। অনেকেই বলেছিল 'সোমাদির এত সুন্দর গলা!' পরে জেনেছি ও অজিত মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্রী ছিল। গান শিখেছিল সুশীল মল্লিকের কাছে। ২০১৫–র বইমেলায় জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে নিয়ে সমীরের বই বেরোল, এটি ধারাবাহিকভাবে উৎস মানুষেই প্রথম বেরোয়। মেলার মাঠে প্রকাশকের স্টলে সোমা গেছে মেয়েকে নিয়ে। ও যে সমীরের স্ত্রী তা স্টলের কেউ জানত না। আর পাঁচটা খদ্দেরের মতো ওর দিকে বইটা এগিয়ে দিয়ে কেউ একজন বলে 'বৌদি এই বইটা নিন। দারুণ বিক্রি। এরই ভেতর আড়াইশ কপি শেষ!' সোমার আনন্দ আর ধরে না। তিন কপি বই কিনে, নিজের পরিচয় দিয়েছিল! দোকানে আলোড়ন পড়ে যায়। ২০১৬–র গোড়ার দিকে ওর অসুখটা ধরা পড়ল। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হল। সোমা বাড়ি ফিরল। যে রোগের নাম শুনলে সুস্থ মানুষ আঁতকে ওঠে সোমা তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। একদিন কথায় কথায় বলল, দেখো দুর্ঘটনা বা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলে তো লোকে ফুস করে চলে যায়, আমি তবু কিছু সময় পেলাম, কী বল! ওঁর ওই কথায় চমকে উঠেছিলাম। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওভাবে কথা বলা যায়! ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল কিন্তু ভেঙে পড়েনি। অসুস্থ শরীর নিয়েও পরিবারের সক্কলকে ভাল রাখার জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না। ঘরের লোক ছাড়াও রিক্সাচালকের ছেলের হাত ভেঙেছে, সোমা তাকে নিয়ে সোজা ডাক্তারখানায়। ওষুধবিষুধ কিনে দিয়ে তবে বাড়ি ফেরা। সেই সোমা প্রায় আড়াই বছর দাঁতে দাঁত চেপে মারণ অসুখের সঙ্গে লড়াই করে ২৫ জুন বিকেলে চলে গেল। ওর ইচ্ছা মতো মরদেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে লাগবে বলে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে রেখে আসা হল। সোমার অকালমৃত্যুতে আমরা একজন অত্যন্ত ভাল মানুষকে, উৎস মানুষের দীর্ঘদিনের বন্ধুকে হারালাম। আমরা শোকস্তব্ধ !

বরুণ ভট্টাচার্য

জ্যোতিষকে কুসংস্কারবিরোধী আইনের বাইরে রাখা মূর্খামি, নয়ত দ্বিচারিতা

ভবানীপ্রসাদ সাহু

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে কুসংস্কার ও কালাজাদুর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের জন্য ইতিবাচক একটি উদ্যোগ হয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা গেল, 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অভ সুপারস্টিশাস অ্যান্ড ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট' নামে এই আইনের খসড়া তৈরি করে তা রাজ্য সরকারের বিবেচনার জন্য জমা দিয়েছে রাজ্য আইন কমিশন। বিধানসভায় অনুমোদিত হলে তা আইনে পরিণত হবে। এর আগে মহারাষ্ট্রে ২০১৩ সালে এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। 'মহারাষ্ট্র অন্ধ শ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-র ডা. নরেন্দ্র দাভোলকরের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছিল এটি। এরপর কর্ণাটক, আসাম, তামিলনাড়ুতেও এই ধরনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও অবশ্যই এটি একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা এবং আইনটির প্রয়োজন বহুদিন আগে থেকেই ছিল। এই আইন অনুযায়ী তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝা, গুণিন, ডাইনি হত্যা, যাদুটোনার মতো নানা কিছুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। এই ধরনের আইন কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হবে, এর ফলে কুসংস্কার সত্যিই কত দ্রুত নির্মূল হবে ইত্যাদি প্রশ্ন এখন তুলে লাভ নেই। কিন্তু আইনটি প্রসঙ্গে জানা গেল, 'তবে জ্যোতিষশাস্ত্র এর আওতায় থাকছে না' (এই সময়; ৪.১.১৮)। এবং এটি জেনেই সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই এই আইনটির জন্য আন্তরিকতা কতটা।

কারণ ঐ ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, ওঝা-গুণিনের কাজকর্ম এখন ক্রমশ কমেই এসেছে, কয়েক দশক আগে যেমন ছিল তেমনটি যে নেই তা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তবু কিছু মানুষের মধ্যে এখনো তা টিকে আছে এবং তার জন্য আইনের প্রয়োজনও আছে।

অন্যদিকে জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা ও জ্যোতিষ ব্যবসায়ীদের খদ্দের কিন্তু বিপুল সংখ্যায় আছে। হতদরিদ্র মানুষের চেয়ে (যাঁরা মূলত ঐ ওঝা-গুণিনের আশ্রয় নেন), সমাজের সচ্ছল ধনী ব্যক্তিরা মূলত এর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হন না, এবং জ্যোতিষে বিশ্বাসী এমন মানুষের সংখ্যা এখনো কমার কোনও লক্ষণ নেই। জ্যোতিষবিদ্যা যে নির্ভেজাল একটি কুসংস্কার, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই।

এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু আলোচনার আগে, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কিছু দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন, 'মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা। জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ হচ্ছে হিন্দুদের অত্যন্ত ক্ষতিকারক কুসংস্কারগুলির মধ্যে একটি। তুমি দেখবে জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের সব রহস্যময় ব্যাপারে আস্থা সাধারণত দুর্বল চিত্তের লক্ষণ। অতএব যখনই ঐ সব বিষয় আমাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে তখনি আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া,— ভাল খাদ্য, আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করা।' (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা; ১০ম খণ্ড; ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯; পৃ. ১৯৪-৫)

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে (১ নভেম্বর, ১৯৩১) লিখেছিলেন, '...লক্ষ যোজন দূরে কোন গ্রহ উপগ্রহ কোথাও বিশেষভাবে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আছে বলেই সকালবেলা উঠেই তোমার হাঁচি আরম্ভ হোলো, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে সেটা গেল পুড়ে, চোখের ডান পাতা কাঁপতে শুরু করল, বুঝতে পারলে আজ বাজার করতে পাঠালে বাজারদর যাবে চড়ে, কেন না রাহু দৃষ্টি দিচ্ছে তোমার বাজারের স্থানে,

ওদিকে তোমার গ্রাম সম্পর্কে মাসতুতো বোনের ভাসুরপোকে তোমার দেওরের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছ বলে আত্মীয়বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কেন না শনি ছিল তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দের উপর চেপে এসব কথা তোমার মন থেকে সরিয়ে দাও। ... বিশেষ কারণে যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে যায়— কেতু নামক পদার্থের ওপর ওর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে করাঘাত করার এত বড় দুর্বলতা আর কী হতে পারে! ...যদি বলো পুরুষকারের জোরে গ্রহফল খণ্ডন হয়, তবে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো পুরুষকার পুরো পরিমাণে জোর পেতে পারে। ... তাছাড়া ভৃগুমুনি সব নক্ষত্র ও সব গ্রহ তাঁর হিসাবের মধ্যে আনেন নি— সম্ভবও নয়, জানাও ছিল না। তারা কি বেকার বসে আছে? অতগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টি হিন্দু সন্তানের ভাগ্যকে এড়িয়ে গেল কী করে? আর কেন? এসব জঞ্জাল নিয়ে মনকে অবসাদগ্রস্ত করে কী হবে!" (সংশোধিত) (মূল সূত্র — 'আচার বিচার, চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৬৪)

কুসংস্কারবিরোধী আইনে জ্যোতিষকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ও অনুরোধ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার শুরুতে এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করার কারণ, সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতার বাসস্ট্যান্ডসহ রাজ্যের নানা স্থানে বহু মনীষীর ছবিসহ বাণী বা উদ্ধৃতি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে; এটি সুন্দর সুস্থ ও অভিনন্দনযোগ্য একটি কর্মসূচি। আর এই সব মনীষীর মধ্যে বাঙালির বড় আপন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ মনে হয় পুরোভাগে রয়েছেন। কুসংস্কারবিরোধী আইনে জ্যোতিষকে বাদ রাখলে বুঝতে হবে এঁদের ছবি আর বাণী দেওয়াই সার, তাঁদের শিক্ষা ও বক্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং অসম্মান বা অস্বীকার করাই হয়।

শুধু এঁরা বা বিজ্ঞানসচেতন অসংখ্য মানুষ নন, পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলও জ্যোতিষকে অবৈজ্ঞানিক বলে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন ১৮জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীসহ ১৮৬ জন বিজ্ঞানী নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিস্ট' (সংখ্যা ৩৫, ১৯৭৫) ও লন্ডনের 'নিউ হিউম্যানিস্ট' (সংখ্যা ৯১, ১৯৭৫) পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে স্পষ্টভাবে জানান, জন্মমুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে— এরকম ভাবার পেছনে কোনও যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে, গহনক্ষত্রের অবস্থান কোনো বিশেষ দিন বা সময়কে কোনো বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলেছে, কারণ 'গ্রহনক্ষত্রগুলির অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে তারা পৃথিবীর ওপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার পরিমাণ অতি নগণ্য।" তাঁরা আরো বলেন, 'মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বহির্শক্তির ওপর নির্ভর করতে চায়। ভাবতে চায়, পৃথিবী-বহির্ভূত কোনো অলৌকিক শক্তি বুঝি তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার, আমাদের ভবিষ্যৎ নিজেদের ওপর নির্ভর করছে, কোনো গ্রহনক্ষত্রের উপর নয়।"

১৮জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ীসহ ১৮৬ জন বিজ্ঞানী নিউ ইয়র্কের 'দ্য হিউম্যানিস্ট' ও লন্ডনের 'নিউ হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে স্পষ্টভাবে জানান, জন্মমুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে— এরকম ভাবার পেছনে কোনও যুক্তি নেই।

তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, 'জ্যোতিষচর্চার ধ্বজাধারীদের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।'

এখনো জ্যোতিষবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে। মহাকাশে অবস্থান পরিবর্তনশীল গ্রহনক্ষত্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে এক অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তিকে কল্পনা করা হয়েছিল। এই শক্তিকেই ভাবা হয়েছিল দৈনন্দিন জীবনের নানা ওঠাপড়া, সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদের নিয়ন্ত্রক হিসেবেও। চেষ্টা করা হয়েছিল গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে নিজেদের জীবনের নানা পরিবর্তনের পেছনে ঐ অলৌকিক নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার হদিশ পেতে। এইভাবে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা মিলেমিশে গিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর পর ধীরে ধীরে বিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতির্বিদ্যা এবং

অপবিজ্ঞান হিসেবে জ্যোতিষবিদ্যা আলাদা হতে থাকে।

প্রাচীনকালে রাহু-কেতুকে গ্রহ ভাবা হত। এখন জানা গেছে তারা পৃথিবী ও চাঁদের গতিপথের দুটি ছেদবিন্দু মাত্র, তাদের বস্তুগত কোনো অবস্থান নেই। একইভাবে সূর্য নামক নক্ষত্র ও চাঁদ নামক উপগ্রহকেও গ্রহ ধরা হয়েছিল। অন্যদিকে ইউরেনাস-নেপচুনের মতো পরবর্তীকালে নানা গ্রহের উল্লেখ জ্যোতিষে করা সম্ভব হয় নি। এই সব ফাঁকির ওপর দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতিষবিদ্যা। এবং গ্রহনক্ষত্রগুলির সামান্য আকর্ষণ বল বা অন্য কিছু প্রভাব যে মানুষের জীবনের ঘটনাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে না তাতে এখন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তাই জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা ও তার ওপর নির্ভরতা নির্ভেজাল একটি কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়।

অথচ তাকেই কুসংস্কারবিরোধী আইনে বাদ রাখা হচ্ছে। এই আইনে যে সব কুসংস্কারের কথা বলা হয়েছে, ঐ সব ছুটকো-ছাটকাগুলির তুলনায় জ্যোতিষিক কুসংস্কারের ব্যাপ্তি, প্রভাব ও ক্ষতি অনেক অনেক বেশি। ক্রমশ কমতে থাকা ঐ সব তুকতাক, তাবিজ, মাদুলি বা ওঝা-গুণিনের চেয়ে জ্যোতিষে বিশ্বাসী ও তার ফসল গ্রহরত্ন, মেটাল ট্যাবলেট বা জোডিয়াক রিং-এর মতো লোকঠকানো মালকড়ির বাজার এখন অনেক বেশি— ক্রমবর্ধমান বললেও অত্যুক্তি হয় না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেতানেত্রীর কাজকর্মের হঠাৎ বেরনো সংবাদ থেকে তা বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও জ্যোতিষকে বাদ দিয়ে এমন একটি বিকলাঙ্গ আইন করার পেছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।

এক, যারা এই আইন করার হর্তাকর্তা, তারা নিজেরাই জ্যোতিষের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। ওঝার কাছে যেতে তাদের প্রেস্টিজে লাগে— যায় জ্যোতিষী বা তান্ত্রিকের কাছে। মাদুলির চেয়ে কয়েক শত বা হাজার টাকার গ্রহরত্ন বা জোডিয়াক রিং নামক মাদুলি তাদের কাছে বেশ সম্মানের। তাই কুসংস্কারবিরোধী আইন করা ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা কতটা আর কতটা লোক দেখানো তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে হয়।

দ্বিতীয়ত, জ্যোতিষ কুসংস্কারের ব্যবসায় কোটি কোটি টাকা খাটছে। সেই তুলনায় তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র, ওঝা-গুণিন বা যাদুটোনার মতো ব্যাপারগুলি দু'চার টাকার কারবার। এত বড় জ্যোতিষব্যবসার গায়ে হাত দেওয়ার সাহসের অভাবও তাকে কুসংস্কারবিরোধী আইনের আওতার বাইরে রাখার অন্যতম কারণ হতে পারে।

তৃতীয়ত, দেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চিত্রাভিনেতা, ক্রীড়াবিদ ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে তথাকথিত বহু শিক্ষিত মানুষ আর বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী কিছুজনও জ্যোতিষের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পাশাপাশি ঐ তুকতাক ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির আশ্রয় নেয় মূলত রিদ্র, নিম্নবিত্ত বা অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত মানুষজনও প্রতারিত হন, তবু জ্যোতিষকে এই আইনের বাইরে রাখার পেছনে ঐসব হোমরাচোমরা ব্যক্তিদের বিশ্বাসকে কুসংস্কারবলে দাগিয়ে দেওয়ারমতো সত্যি কথাটা বলার অনীহাও এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।

তাই দায়িত্ব এসে পড়ে সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের উপর। পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত কুসংস্কারবিরোধী আইন অবশ্যই

ক্রমশ কমতে থাকা ঐ সব তুকতাক, তাবিজ, মাদুলি বা ওঝা-গুণিনের চেয়ে জ্যোতিষে বিশ্বাসী ও তার ফসল গ্রহরত্ন, মেটাল ট্যাবলেট বা জোডিয়াক রিং-এর মতো লোকঠকানো মালকড়ির বাজার এখন অনেক বেশি— ক্রমবর্ধমান বললেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বাগত, কিন্তু তাকে কিছুটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য জানানো, জনমত গড়ে তোলা ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এঁদেরই এগিয়ে আসতে পারে। যে যেখানে যতটুকু পারেন রাজ্য জুড়ে এ কাজ এখনই শুরু করা দরকার।

[সব শেষে আরো দু'চার কথা— অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী 'কুসংস্কার' হচ্ছে ''প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন শক্তি বা এমন কিছু অস্তিত্বে বিশ্বাস, অজ্ঞাত বা রহস্যময় কেন কিছুর প্রতি অযৌক্তিক ভীতি।'' সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' অনুযায়ি 'কুসংস্কার' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ''ভ্রান্ত যুক্তিহীন ধারণা অথবা ধর্মবিশ্বাস, গোঁড়ামি।'' স্পষ্টত কুসংস্কারের প্রকৃত অর্থ অনযায়ি একটি পূর্ণাঙ্গ কুসংস্কারবিরোধী আইনের পরিধি অনেক বড়।]

উ মা

মরিতে চাহি না আমি

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' — বিশ্বকবির মতো শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও মানুষ তো বাঁচতেই চায়। সৃষ্টির এই রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করতে চায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ব্যতিক্রমও আছে, কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে, এর সংখ্যাও কম নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO-র তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে বছরে দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিদদের আশঙ্কা, ২০২০ নাগাদ এই আত্মহত্যাই সর্বাধিক প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই হু ১০ সেপ্টেম্বর দিনটিকে 'আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

মানুষ বহুবিধ কারণে আত্মহত্যা করে। এর সিংহভাগই মানসিক বৈকল্য। নিজের জীবনের প্রতি অপরিসীম নৈরাশ্য ও ধিক্কার এই চরম পথে টেনে নিয়ে যায়। আমার বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজনই নেই— অবসাদগ্রস্ত মন একটা মানুষকে এভাবেই ভেতরে ভেতরে তাড়িয়ে বেড়ায়। তারপর আবেগের বশে হঠাৎ কোনও একদিন সে জীবনটাকে শেষ করে দেয়। তথ্য বলছে, ১৫ থেকে ৪০— যখন মানুষের মন সবচেয়ে আবেগঘন, সেই বয়সেই আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

আজকাল স্ট্রেসের যুগ। সবাই প্রতিযোগিতায় ছুটছে, বিশেষত যুবসমাজ। নিজের লালিত ভাবনা ও বাস্তবের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলেছে সঙ্ঘাত। চাওয়া আর পাওয়া মিলছে না, তার থেকে হতাশা এবং শেষে জন্ম নিচ্ছে অবসাদ। এই অবসাদ নানান দুর্জ্ঞেয় গলিপথ দিয়ে ঢুকছে হৃদয়ের গভীরে। সৃষ্টি করছে উদ্বেগ ও অস্থিরতা। অর্থাভাব, অন্যের কাছে উপেক্ষা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, প্রেমে বিফলতা, প্রিয়জনের মৃত্যু, ভয়, কর্মস্থলে অপমান– নানা কারণে কারো মনে লাগতে পারে বড় আঘাত। অনেকে সামলে উঠতে পারে না। একদিন গলায় ফাঁস দেয়, নয় রেলের চাকায় বা বিষ খেয়ে প্রাণ দেয়। কিছু আত্মহত্যা ঘটে দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পেতে বা নিশ্চিত দণ্ড থেকে রেহাই পেতে। কিছু ক্ষেত্রে মাদকাসক্তিও ডেকে আনে আত্মহননের ইচ্ছা। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার নীল তিমির খপ্পরে পড়ে বেশ কিছু তরুণ-তরুণীর আত্মহনন ঘটেছে। চটুল বিজ্ঞাপনের রমরমার ভোগসর্বস্ব যুগে বাড়ছে নিত্যনতুন চাহিদা ও লোভ, সেটাও কয়েক ক্ষেত্রে অবসাদ ডেকে আনছে হতাশায়।

প্রতিদিনই সংবাদমাধ্যমে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার খবর মেলে। যৌবনকালের চূড়ান্ত আবেগপ্রবণ মন প্রেমে ব্যর্থতায় অনেক সময়েই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবনটা যে অনেক বড়, আবেগসর্বস্ব প্রেম যে তার কাছে কিছুই নয়, সে কথা তারা ভাবে না। এক সাম্প্রতিক উদাহরণ— প্রেমিক প্রেমিকাকে বলছে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না, মরে যাব।' অনিচ্ছুক প্রেমিকা জবাব দিচ্ছে, 'মরে দেখাও, তাহলে বুঝব।' হঠকারী প্রেমিক মেবাইলে ভিডিও তুলে আত্মহত্যা করল— ভাবা যায়! এই মোবাইলই এখন কত আত্মহত্যার কারণ হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই হয় প্রেম, প্রত্যাখ্যান ও পরিশেষে অবসাদ। অপরিণত মন কত তাজা প্রাণ ঝরিয়ে দেয় অকালে।

দেহ আর মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে দেহেও তা সংক্রামিত হয়। মনটা আসলে কী? কোথায় তার বাস? বুকের মধ্যে হৃদয়ে? না, মনের বাস মস্তিষ্কে। হাইপোথ্যালামাসের জটিল গহন প্রকোষ্ঠে তার ক্রিয়াকলাপ। সাধারণ চোখে তার গতিবিধি বোঝা দায়। মনস্তত্ত্ববিদরাই দীর্ঘ কথাবার্তার মাধ্যমে মনের অতল গভীরে ডুব দিয়ে থই পান। সঠিক কোন আঘাতটা রোগীর মনের দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বুঝে নিয়ে তার হারানো চাবিকাঠিটা খুঁজে বের করেন। ফলস্বরূপ রোগী ক্রমে পুরোন জীবনের ছন্দে ফিরে আসে, সুস্থ হয়ে ওঠে।

মানসিক অবসাদের প্রাথমিক লক্ষণগুলো হল– ঘুম আর খিদে না হওয়া, খিটখিটে মেজাজ, কথাবার্তা কম বলা, কারো সঙ্গে না মেশা, একা একা থাকা ইত্যাদি। ক্রমে তা বেড়ে গেলে মনের অস্থিরতা, কোনও কিছুই ভাল না লাগা, দুর্বলতা, হাত-পা কাঁপা ইত্যাদি। মন আর স্নায়ু প্রায় একই জিনিস, শুরু হয় স্নায়ুর নানা বিভ্রাট। তাই মনোরোগকে স্নায়ুরোগও

বলা হয়। স্নায়ুবিভ্রাটে যে কী কী উপসর্গ হতে পারে না তা বলা দুঃসাধ্য। অনেক কিছুই হতে পারে, যার গভীর গোপনে ক্রিয়া করছে মনোবিকলন। তাই মানসিক অবসাদের প্রাথমিক উপসর্গগুলো চোখে পড়লেই রোগীকে বদ হাওয়া গায়ে লেগেছে ভেবে ওঝা গুণিনের কাছে না গিয়ে মনোবিদের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দেশে ও সমাজে মনোবিদ বা সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া নিয়ে একটা বাধো-বাধো ভাব আছে। সবাই ভাবেন— ও কি পাগল হয়ে গেল নাকি! উন্মাদ রোগ ভয়ানক রোগ, সারে না, ওর থেকে দূরে দূরে থাকাই ভাল, পাগলা কামড়ে দিতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোয় মনোচিকিৎসকের চেম্বারেই বেশি ভিড়। যত উন্নতি, তত চাহিদা আর তত স্ট্রেস ওসব দেশে। তাই মনোবিকলনও সেখানে বেশি। সঠিক চিকিৎসায় তাঁরা সেরেও উঠছেন।

পরিশেষে, আত্মহত্যা প্রতিরোধে আমরা সাধারণ মানুষ কী করতে পারি? প্রথমত, চাহিদা কমাতে হবে, চটুল বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে নিত্যনতুন জিনিসে লোভ দমন করতে হবে। প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করল বলে জীবন ব্যর্থ— এমন অবান্তর ভাবনা পরিহার করতে হবে। সহজ সরল বাস্তবোচিত ভাবনা নিয়ে চলা প্রয়োজন। তাহলেই আসবে মনে প্রশান্তি আর তা পরিব্যাপ্ত হবে শরীরে। দুর্ভাগ্যবশত যারা নানা কারণে মানসিক অবসাদের কব্জায় পড়েই গেছে তাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মোটেই নয়, এগিয়ে দিতে হবে সহানুভূতির হাত। ওরা ভেতরে ভেতরে বড় কাঁদছে, বেরোতে চাইছে কিন্তু পারছে না ওই মানসিক বেড়াজাল থেকে। বড় করুণ তাদের অবস্থা। এড়িয়ে না গিয়ে তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে দুটো কথা বলুন, হয়তপ্রথম প্রথম ওরা মুখ ফিরিয়ে নেবে; কিন্তু সত্যিই যদি আপনার দরদ থাকে দেখবেন আস্তে আস্তে ওরা আপনার কাছে মুখ খুলছে, কিছুদিন পরে তাদের মুখেও ফুটছে হাসি। জীবনটাকে গলগ্রহ নয়, অর্থবহ ভাবতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে পুরোনো জীবনছন্দে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখকষ্ট কম ভোগ করতে হয় নি, বহু প্রিয়জন একে একে চলে গেছেন, তবুও কবি সৃষ্টিশীল কাজ থেকে বিরত হন নি। জগতের আনন্দযজ্ঞে তিনি সদাই সামিল ছিলেন। তাই লিখেছেন— 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

উমা

চাঁদাবাজি

সাধন বিশ্বাস

সংজ্ঞায় **চাঁদাবাজি**ঃ কোনো অনুষ্ঠান, উৎসব উপলক্ষে বা নানান অজুহাতের দোহাই দিয়ে কৌশলে বা জবরদস্তিতে সকল স্তরের মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায়কে চাঁদাবাজি বলা হয়। যেমন দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী ইত্যাদি সকল দেবদেবীর পুজো উপলক্ষে যেমন আছে, তেমন আছে শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গাদেবীর পুজো, মকরসংক্রান্তির মেলা, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, নানান আঞ্চলিক মেলা ইত্যাদির 'নরম-গরম-চরম' চাঁদাবাজি। অনেক দেবদেবীর আবার রূপভেদ আছে, তাঁদের মধ্যে দুর্গাদেবী পূজিতা হন প্রধানত আরও দুটি রূপে— জগদ্ধাত্রী আর বাসন্তী নামে। এই দুই নামের দেবীর অনুষ্ঠানও হয় ভীষণ ধুমধাড়াক্কায়, ধার্য হয় বিরাট অঙ্কের বাজেট আর অবশ্যম্ভাবীভাবে চলে চাঁদার জুলুম। দিকে দিকে আছে রাস উৎসব। আর সবার উপরে চাঁদাবাজিতে টেক্কা চলে নরমুণ্ডধারিণী মাকালীর পুজোয়। যাকে কেন্দ্র করে চলে চাঁদা-জুলুমের প্রবল বিক্রম। আর আছে মোচ্ছব (মহা উৎসব), যা পালন করতে প্রায় সারা বছর ছেলে-বুড়োর দল হানা দেয় চাল-ডাল-টাকা-আলু-কলা আদায় করতে। এই চিত্রটা (মোচ্ছব উৎসব) সর্বাধিক গ্রামকেন্দ্রিক।

হাড়-হিম করা চাঁদাবাজিঃ চোট-বড় হরেক কলকারখানার মালিক, শিল্পপতি, বড় ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, জমি-বাড়ির ক্রেতা-বিক্রেতা, বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের মালিক— এইসব ব্যক্তিদের থেকে 'চাঁদা' নামক বড় অঙ্কের 'তোলা-দাঁও' আদায়ের কৌশল, ধরন-ধারণ আলাদা। এই তোলা তুলতে কোনো পুজো বা ছুতোনাতার প্রয়োজন হয় না। এইসব আদায়খাতের আদায়কারীরাও আলাদা। যেমন ছোট-বড় দাদা বা দাদার টিম, রাজনৈতিক দলের টিম। এরা বড়লোকদের কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা কণ্ঠে দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার থেকে পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার জানান দেয়। একটা দিন ধার্য করে দেয়, ফেল হলে দয়া করে আরও দু-একটা তারিখ মঞ্জুর হয়। কিন্তু তারপরও মিস হলে আসল খেল শুরু হয়। জুলুম, জবরদস্তি, মস্তানির

বাড়বাড়ন্তে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। যেমন ধরুন কোনো এক ঠিকাদার বা ঠিকাদার সংস্থা একটা রাস্তা বা সেতু তৈরির বরাত পেলেন। দাদার দল তাঁদের কাছে এসে রাঙা চোখ দেখিয়ে ভয়ঙ্কর শীতল কণ্ঠে নিবেদন পেশ করল, 'এই দাদা, ছোনলাম এই রাচ্‌তার কাজ লাকি আপনিই ধরেছেন, বেচ করেছেন, আমাদের যে কিচু পাওনাকড়ি ছারতে হোবে মাইরি।' একে উপেক্ষা করবেন? তাহলে যে আপনার ব্যবসা ফতে হয়ে যাবে কিংবা মুণ্ডু বিলা হয়ে যাবে!

আরও কয়েকটি চাঁদাঙ্ক জানি না পুলিশের মাসোহারা তোলা বা ডাক-অর্থ আদায়কে চাঁদা বলা যাবে কিনা, তবে আলোচনা যখন চাঁদা নিয়ে হচ্ছে, তখন এটাকেও চাঁদার সম্মান দেওয়াই সমীচীন হবে। কোনো অবৈধ ব্যবসা বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, যেমন, চোলাই মদের ভাটি, রেশনের চাল ডাল কেরোসিন পাচারকারী স্মাগলিং ব্যবসা, বেশ্যাদের থেকে, মস্তান পার্টির থেকে, দালাল, আড়কাঠি, শিশুশ্রমিক খাটানো হোটেল-রেস্তোঁরার মালিকের কাছ থেকে পুলিশ তোলা আদায় করে। আরও আছে। বাস-লরি ড্রাইভার, দু চাকা-চার চাকা গাড়ির কাগজপত্র দেখবার অছিলায় বা কাগজপত্র ফেল হওয়া মালিকদের থেকে চলে কেস না দেওয়া টাকা আদায়।

আর একটা সুস্থ উপায়ে চাঁদা আদায়কারী দল আছে। তার নাম রাজনৈতিক দল। বিল দিয়ে বা কৌটো ঝাঁকিয়ে চলে এই আদায়। রাজনৈতিক নানান প্রোগ্রামে এই চাঁদার টাকা কাজে লাগে। আর অপহরণ মানি আদায় তো বিরাট ধরনের এক চাঁদা।

বয়সভিত্তিক চাঁদা আদায় গ্রুপঙ্ক শিশু থেকে কিশোর যুবক আধবয়সী থেকে প্রৌঢ় সকল স্তরের বয়সের মানুষ চাঁদা আদায় করে থাকে। ছয়-সাত থেকে দশ-বারো বছর বয়সীরা সাধারণত সরস্বতী পুজোর চাঁদা তোলে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিংবা রাস্তা থেকে পথচারীদের ধরে। ইদানীং (বছর ৪-৫) দেখছি, এরা কালীপুজোর চাঁদা তোলার 'বড় কর্মেও' খাটছে। এই গ্রুপটা রাস্তায় চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে একটা কৌশল করছে, সেটা হল 'বাঁশকল'। বাঁশকলের কথায় ধন্দে পড়লেন তো? তবে শুনুন। একটা বাঁশ (রাস্তার প্রস্থ অনুযায়ী মাপের) আড়াআড়িভাবে কোমর সমান হাইটে উঁচু করে এক প্রান্ত একটা খুঁটির সাথে বাঁধা হয়। এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে খুঁটি সংলগ্ন প্রান্তে আড়াআড়ি বাঁশে চাপ দিয়ে উঁচু-নিচু করা যায়। পথচারী, গাড়ি, মোটরবাইক কাছাকাছি এলে ঝম্ করে সামনে সেই কলের বাঁশ পড়ে যায়। এবার ছোট ছোট চাঁদাবাজদের সমবেত আবদার চলে, কাকু, দাদু, দাদা— আমাদের পুজোয় চাঁদা দিয়ে যান। শিকার যদি গাঁইগুঁই করে তবে কাছাকাছি থাকা বড়রা তাদের খুব হেল্প করে, আরে দিন না দশ-বিশ টাকা; ছেলেপুলে বছরে একবার আনন্দ করবে, মায়ের পুজো বলে কথা...! কিন্তু সেই বড়দের সামান্যতম বিবেচনা বা উপলব্ধি নেই যে এমন কত কলে আটকা পড়ে গচ্চা যাচ্ছে। আর বছরে একবার? হাস্যকর। নানা পুজোর কলে পড়লে বছরে কতবার হয়?

এবার আসি তের-চোদ্দ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর বয়সীদের কথায়। এরা আর বাঁশকলের মধ্যে যায় না। বিল বই হাতে জনবহুল পথে-ঘাটে আর বাড়ি বাড়ি অপারেশন চালায়। এদের মধ্যে অনেকে অবলীলায় চাঁদা আদায়ের কাজ চালাতে চালাতে বিড়ি-সিগারেট ফোঁকে (আর অনুষ্ঠানের সময় তো চাঁদার পয়সায় 'পাগলাপানি' মদ/চোলাই-এর মৌজ আছেই)। এই গ্রুপের কণ্ঠস্বর ইদানীং বেশ ভয়ার্ত আর গরম। ড্রাইভার বেগড়বাঁই করলে এরা অনায়াসে গাড়ির পা-দানিতে উঠে স্টিয়ারিং চেপে ধরে অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি/মোটরবাইক/সাইকেল/রিকশা আটকে রাখে। এদের মধ্যে অনেকেই কস্মিনকালে স্কুলে যায় নি, তবুও সরস্বতীপুজো

ধুমধামটা বেশ জমকালো করে কালীতে আর জগদ্ধাত্রীতে। নাগাড়ে দশদিন পর্যন্ত গমগমিয়ে রাখে দু-দশখানা গ্রাম, মাইকের প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবে, নাচাগানায়। এদের বেশিরভাগেরই কবজিতে স্টিল অথবা তামার বালা থাকে, বারমুডা আর চকরা-বকরা স্কিনটাইট টি-শার্ট পরে।

করা চাই-ই। তবে ধুমধামটা বেশ জমকালো করে কালীতে আর জগদ্ধাত্রীতে। নাগাড়ে দশদিন পর্যন্ত গমগমিয়ে রাখে দু-দশখানা গ্রাম, মাইকের প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবে, নাচাগানায়। এদের বেশিরভাগেরই কবজিতে স্টিল অথবা তামার বালা থাকে, বারমুডা আর চকরা-বকরা স্কিনটাইট টি-শার্ট পরে। বাড়িতে অসুস্থ বাবা-মা, দাদু-ঠাকুরমা দীর্ঘমেয়াদিভাবে ভুগলেও, চিকিৎসা করাবার পয়সা না জুটলেও কিংবা সবার

ঠিকমতো খাওয়া না জুটলেও এদের হাতে স্মার্টফোন অবধারিত থাকবেই। কেউ কেউ আবার বাড়িতে জুলুম করে মোটরবাইক বাগায়। একই বাইকে তিন-চারজন উঠে সাঁইসাঁই গতিতে ছুটে যায় (লক্ষ্য করবেন, এদের বয়সীরাই পথ দুর্ঘটনার শিকার হয় সর্বাধিক)। আরও কত কী যে করে চাঁদাবাজিতে তা আর আলোচনা করলাম না।

এবার আমি ২৪-ছাব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্তদের কায় এই বয়সীদের সংখ্যাটা একটু কম। এদের অনেকে 'মাস্তান ক্লাবের' দাদাদের সঙ্গে যুক্ত। নানারকম মাদক সেবন করে এরা। করে চোরাকারবার। তবে স্মাগলিংটা খোদ নিজের ব্যবসা নয়। 'মাথা-দাদার' কাজ করে কমিশনে। বাকি সময় বিল বই হাতে (বেশিরভাগ কালীপুজোর বিল। পুজো করে থুড়ি) প্রধান সড়কে। এদের প্রধান লক্ষ্য অন্য রাজ্যের এবং এ রাজ্যের ট্রান্সপোর্টের ট্রাক। ছোটখাটো গাড়ি, পথচারি, বাড়ি বাড়ি ইত্যাদি এদের ধাতে নেই। ট্রাক আটকে চেঁচামেচি এরা করে না। গুটকা, পান মশলা চিবোতে চিবোতে শিবনেত্রে (ঠাণ্ডা অথচ ভয়ংকর দৃষ্টি) বিলটি আস্তে করে চালকের দিকে বাড়িয়ে ধরে। চালক যত চেঁচায় চেঁচাক, ওরা নির্বকার। দিতে দেরি হলে হাতের ইশারায় গাড়িটিকে সামান্য সাইড করে রাখতে বলে (যেন ট্রাফিক পুলিশ!)। তারপর শেষ নিদেন আছেই, গাড়ি তো চালাতে হবে নাকি! এই গ্রুপকে একই স্থানে প্রায় সারাবছর সপ্তাহে অন্তত একবার এই চাঁদা আদায় করতে দেখেছি। মিশ্র পোশাকে থাকে এই দল। কেউ বারমুডা-গেঞ্জি, কেউ ফুলপ্যান্ট সঙ্গে অথবা জামা। কারো আবার ফুলপ্যান্টের সঙ্গে সস্তার পাঞ্জাবি। এই বয়সের এদের (অবশ্যই এদের দলভুক্ত) ছেলেরাই সর্বাধিক ধর্ষক হয়। আর গণধোলাইয়ের কাজটি এদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন চাঁদা আদায় করতে করতে এরা এক সাইকেল চোরকে (?) ধরে ফেলল। বনগাঁর ঘটনা। দেখি জনসমক্ষে এক রোয়াকে চোরকে বসিয়ে রেখেছে। তাকে ঘিরে ওরা বসে আছে আর খইনি ডলছে। মাঝে মাঝে এক একজন করে উঠে পালা করে চোরকে লাথি, কিল মারছে। তাদের মুখ দেখে (ভাবান্তরহীন, নির্বিকার) মনে হচ্ছে স্বাভাবিক কোনো নিত্যকর্ম করছে তারা। সহ্য হল না। কণ্ঠনালীতে একটা টনটনে ব্যথা নিয়ে ওখান থেকে চলে এলাম।

সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ এবং তদূর্ধ্বরা সাধারণত ধর্মবিষয়ক চাঁদা তোলায় ব্যস্ত থাকে। এই দলে বর্ণপরিচয়হীন অশিক্ষিতরা যেমন আছে, আবার আছে শিক্ষিত জনও। আছেন বিদ্যালয় শিক্ষকরা, ধার্মিকজনেরা। এই পূর্ণাঙ্গ চিত্রের দলটি আসে মোচ্ছব, মন্দির নির্মাণ বা মন্দির সংস্কার বা রাস উৎসবের চাঁদা তুলতে। এদের থেকে শারীরিক-মানসিক হেনস্থার সরাসরি শিকার হবার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু পরবর্তীতে নানান সামাজিক হেনস্থা করে নিজেরা প্রচ্ছন্ন থেকে।

নগদ টাকার সঙ্গে চাল-ডাল-আলু-কলা-মূলোটা আদায় করবার কৌশল, অভিনয় বেশ মোলায়েম। বেশ কয়েকটা বুদ্ধি, চাতুরি অবলম্বন করে বস্তা বস্তা চাল নিয়ে যায় মোচ্ছবের জন্য। গোছা গোছা টাকা। কয়েকজনকে জানি, যারা প্রতি বছর মোচ্ছব দেয় বাড়িতে চাঁদা তুলে। অনুষ্ঠান করেও বেশ উদ্বৃত্ত থাকে। বিক্রি হয় বা খাওয়া হয় বাড়িতে।

চাতুরির কথাটা বলি। ধরুন ভিন্ গাঁ থেকে একদল মোচ্ছব চাঁদা আদায়কারী এল আমার গ্রামে। এসেই তারা আমার গ্রামের পরিচিত সোর্স (যারা একটু ধার্মিক গোছের, বয়স্ক এবং প্রভাবশালী) সঙ্গে নেয়। এতে করে আদায়টা দু-তিন গুণ বেশি হয়। 'না' করা কঠিন হয়।

দলটি বাড়ির মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে চাল-ডাল-আলু বয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাইকেল বা রিকশা। হাতে তিন-চারদিনের অনুষ্ঠানসূচির ছাপানো হ্যান্ডবিল। বিল বই থাকে না। এবার আমার গ্রামের সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি বাড়ির কর্তা/গিন্নির উদ্দেশ্যে মোলায়েম সুরে (ভণ্ড-ধার্মিক কণ্ঠ) হাঁক পাড়ল, 'কই মা গো, কোথায় গেলে সব? এই এনারা এয়েচেন মোচ্ছবের চাঁদা নিতে, যা পার দাও'। 'যা পার' বলতে চাল-ডাল-আলু-কলা আর নগদ মিলিয়ে একশোর ধাক্কা। কেউ যদি শুধুমাত্র দশ টাকার নোট ধরায় তবে অবধারিত শুনতে হবে, 'হাঁ মা, এতে কি আর এসব অনুষ্ঠান হয়? যা সব খরচাপাতি বেড়েছে! আরে মা, গোবিন্দের নামে দিলে জলে যাবে না, সবই তোলা থাকবে। এসব সম্পত্তি, টাকা পয়সা সবই মায়া।' তারপর বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলবে, 'হরে কৃষ্ণ! সবই তোমার ইচ্ছা'! বিদায়বেলায় অনুষ্ঠানসূচি ধরাতে ধরাতে বলবে, 'যেও সব, জানো তো এবার রাধারানী কীর্তনিয়া আসছে'।

এই তো হল মোটামুটি চাঁদাবাজি চিত্র। আরও অনেক কিছু জানাতে পারলাম না, পরবর্তীতে সুযোগ হলে চেষ্টা করা যাবে। এই চাঁদাবাজির এবং অনুষ্ঠানবাজির অকল্যাণে যেভাবে সামাজিক বিপর্যয়, পরিবেশদূষণ ঘটে, তার কথাও অন্য এক পর্বে আলোচনা করা যাবে।

উমা

পুস্তক পর্যালোচনা

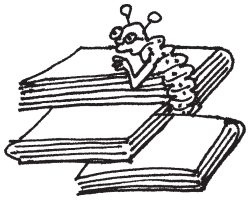

ভাবার খোরাক জোগাবে

১) প্রশ্নোত্তরে হিন্দুত্ববাদী অপবিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞান ▮ প্রকাশকঃ বর্ণমালা (জানুয়ারি ২০১৮), দাম ১০ টাকা

আমাদের চারপাশে যে ধরনের বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী অপবিজ্ঞানের আধিক্য ঘটতে শুরু করেছে তার শক্ত হাতে মোকাবিলা করার জন্য এই বইটি পড়ার ভীষণ দরকার। যখন বিভিন্ন রাজ্যের পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের অপবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে 'বৈদিক বিমান' নিয়ে গবেষণা পত্র পাঠ হচ্ছে, ডারউইন তত্ত্বকে খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে— এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কোনটা ঠিক, এর উত্তর খোঁজা জরুরি বৈকি! আর এই অপবিজ্ঞান আমরা তথাকথিত শিক্ষিতরাই সুচারুভাবে প্রচার করে চলেছি। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত সব কর্মীকেই এই বইটা পড়ার অনুরোধ রাখছি। ছবিগুলো যদি আরো একটু বড় এবং ঝকঝকে, পরিষ্কার হয় তাহলে বইটা আরো আকর্ষণীয় হবে বলে আমার মনে হয়। তাতে যদি দাম দু-পাঁচ টাকা বাড়ে খুব ক্ষতি নেই। আর প্রফেসর মুকুন্দদের ১৯৭৪-এর গবেষণাপত্রটি অনুবাদসহ যোগ করা গেলে বইটির ভার আরো বাড়বে।

২) স্বপ্ন যখন সমাজ গড়া ▮ দিলীপ চক্রবর্তী ▮ প্রকাশকঃ চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ও গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ (কলকাতা বইমেলা, ২০১৮), দাম ৮০ টাকা

সমাজের অধোগতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া (প্রক্রিয়া বলার কারণ, এই ঘটনাগুলো কিছুটা সচেতনভাবে এবং বেশ কিছুটা অচেতনভাবে মানুষের সাহায্যেই তৈরি)— যেমন, অশিক্ষা বা শিক্ষাহীনতা, অন্ত্যজশ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের নেশা, অস্পৃশ্যতা, নাবালিকার বিয়ে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সমাজের দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি— বাপন নামের এক বাচ্চা ছেলের চোখ দিয়ে লেখক দিলীপ চক্রবর্তী আমাদের দেখাতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাপনের মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে হওয়া উচিত, তা বলেছেন। উপন্যাসোপম এই লেখায় গল্পের সাহায্যে লেখক কোনো এক জনপদের তথাকথিত উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ সামাজিক অবস্থানের মানুষের (পলান ঘোষ এবং তাঁর সম্প্রদায়) এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের (বাপন সর্দার এবং তার আত্মীয় পরিজন) মানুষের প্রাত্যহিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টানাপোড়েন, মা এবং বাবার শরীর খারাপ এবং সেই সূত্রে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বর্ণনা করেছেন খুব ভালভাবে। তবে বাপনের বয়স আন্দাজ করা গেল না। প্রথম পাতায় ক্লাস নাইনের ছাত্র বলা হলেও পরে উঁচু ইস্কুলে যাবার কথা বলা হয়েছে, এক সময়ে ক্লাস ফাইভের হয়ে খেলার কথাও বলা হয়েছে। এই বিষয়ে একটু সচেতন হলে ভাল হয়। আর সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন যে এত সহজ সরল নয়, তা আমরা ভুক্তভোগীরা সবাই জানি। রামমোহন থেকে শুরু করে আজ অবধি যত সমাজসংস্কারক সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, অনেক সময় নিজের জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়েছে।

৩) বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা ▮ সম্পাদকঃ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু ▮ ঊনবিংশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৮, দাম ১০ টাকা

১৬ পাতার এই ছোট্ট পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোয় কিনা জানা নেই। বেরোলেও পাঠকসংখ্যা যে কম তা হলফ করে বলা যায়। ছোট হলেও পত্রিকাটি যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায়। যেমন, সুরেশ কুণ্ডুর লেখা প্রবন্ধটি 'কুসংস্কারবিরোধী আইন চাই'। প্রথম মহারাষ্ট্রে এই কুসংস্কারবিরোধী আইনটি বলবৎ হয় ২০১৩ সালে (অর্থাৎ শিবসেনার আমলে)। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেও ২০১৬ সালে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ সুপারস্টিশন অ্যান্ড ব্ল্যাক ম্যাজিক প্র্যাকটিসেস বিল, ২০১৬ নামে একটা বিল পাস হয়। বিলের বিভিন্ন ধারা-উপধারা এই লেখায় উল্লেখ করা আছে। অন্য রাজ্যেও এই ধরনের বিল তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে। পত্রিকাতে আরো এই ধরনের লেখা থাকলে ভাল হয়। অন্য খবরের কাগজের ক্লিপিংসের চাইতে এই ধরনের লেখা অনেক বেশি জরুরি বলে আমার মনে হয়।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়